জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

কৃষিশিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণী

রচনা
মোহাম্মদ হোসেন ভূঁইয়া
ডঃ মোঃ আবদুল হক
মোঃ আমিনুল ইসলাম
আলাউদ্দিন বিশ্বাস

সম্পাদনা
গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিমিটেড

প্রচ্ছদ
সেলিম আহ্‌মেদ

চিত্রাঙ্কন
বীরেন সোম

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নকর্ম মুলত কৃষিভিত্তিক এবং কৃষিশিক্ষা গ্রহণ ও দক্ষতা অর্জন হচ্ছে কৃষি-উন্নয়নের মূল হাতিয়ার। তাই মাধ্যমিক স্তরে কৃষি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হলে কৃষির প্রয়োগযোগ্য প্রযুক্তিসমূহের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক- এই উভয় দিকেই শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জন আবশ্যক। সেদিক বিবেচনা করে এই পুস্তকে কৃষিশিক্ষা, উদ্যান ও ফসল, বনায়ন, মাছ চাষ ও গৃহপালিত পশুপাখি পালনের প্রায়োগিক প্রযুক্তিসমূহ সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর কর্মসংস্থান, শ্রম ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের জন্য ব্যবহারিক কাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণীর কৃষিশিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলোর প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়		বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসল	
	প্রথম পরিচ্ছেদ	কৃষি জলবায়ু	১
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	মাটি	৬
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ	মাটি উর্বরতা ও ভূমিক্ষয়	১০
	চতুর্থ পরিচ্ছেদ	উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান	১৭
	পঞ্চম পরিচ্ছেদ	বীজ	২৩
	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	কৃষি যন্ত্রপাতি ও সেচ	২৯
	সপ্তম পরিচ্ছেদ	শস্য সংরক্ষণ	৪১
	অষ্টম পরিচ্ছেদ	ফসল চাষ	৪৯
দ্বিতীয় অধ্যায়		বনায়ন	
	প্রথম পরিচ্ছেদ	বন পরিচিতি ও বনবিধি	৭০
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	বন নার্সারি	৭৭
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ	বনায়ন	৮৯
	চতুর্থ পরিচ্ছেদ	বৃক্ষ কর্তন ও সংরক্ষণ	৯৫
তৃতীয় অধ্যায়		মাছ চাষ	
	প্রথম পরিচ্ছেদ	মৎস্য সম্পদ	১০২
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	পুকুরে মাছ চাষ	১১২
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ	চিংড়ি চাষ	১২৮
	চতুর্থ পরিচ্ছেদ	মাছের রোগ ও প্রতিকার	১৩৪
	পঞ্চম পরিচ্ছেদ	মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ	১৩৮
চতুর্থ অধ্যায়		গৃহপালিত পাখি পালন	
	প্রথম পরিচ্ছেদ	হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন	১৪৩
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	মুরগি পালন	১৪৮
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ	পুকুরে হাঁস, মুরগি-মাছ এর সমন্বিত চাষ	১৫৭
	চতুর্থ পরিচ্ছেদ	হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন	১৬৩
	পঞ্চম পরিচ্ছেদ	হাঁস-মুরগির খাদ্য	১৬৭
	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	হাঁস-মুরগির রোগ ও প্রতিকার	১৭১
পঞ্চম অধ্যায়		গৃহপালিত পশু পালন	
	প্রথম পরিচ্ছেদ	গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন	১৭৯
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপন	১৮৬
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ	গাভীর দুধ দোহন	১৯১
	চতুর্থ পরিচ্ছেদ	পারিবারিক ছাগল পালন	১৯৪
	পঞ্চম পরিচ্ছেদ	গবাদি পশুর রোগ	২০০

প্রথম অধ্যায়

মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসল

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষি জলবায়ু

আবহাওয়া ও জলবায়ু

কোনো দেশের জলবায়ু সমবন্ধে জানতে হলে প্রথমে সে দেশের আবহাওয়া সম্পর্কে জানা দরকার। আবহাওয়া বলতে কোনো স্থানের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, সূর্য কিরণ, বায়ুর চাপ, কুয়াশা প্রভৃতির দৈনিক সামগ্রিক অবস্থাকে বোঝায়। আবহাওয়া দিনের যে কোনো সময়ের জন্য হতে পারে। আবহাওয়া প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। কোনো স্থানের ২০-২৫ বছরের আবহাওয়ার গড়কে সেই স্থানের জলবায়ু বলা হয়। জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশ, সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে উচ্চতা, সমুদ্র হতে দূরত্ব, বায়ু প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, সমুদ্র স্রোত, পাহাড় ও গাছপালার ওপর। জলবায়ু কৃষি উৎপাদনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাই গাছপালা ও কৃষি উৎপাদন দেখেও কোনো স্থানের জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে উচ্চতা, দূরত্ব, তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ বা সমভাবাপন্ন। পরিমিত বৃষ্টিপাত, মধ্যম শীতকাল ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের জলবায়ু কৃষি উৎপাদনের জন্য খুবই সহায়ক।

বাংলাদেশের জলবায়ুর ওপর ভিত্তি করে ফসল উৎপাদনের জন্য সারা বছরকে প্রধানত ২টি মৌসুমে ভাগ করা হয়েছে; যথা-

ক. রবি মৌসুম

খ. খরিপ মৌসুম।

ক. রবি মৌসুম

আশ্বিন মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সময়কে (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য মার্চ) রবি মৌসুম বলে। এই মৌসুমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত কম। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, গাজর, লাউ, শিম, টমেটো, শীতকালীন সবজি, বোরো ধান, গম, আলু ও সরিষা এই মৌসুমের প্রধান মাঠ ফসল। ফসল ফলানোর জন্য এই মৌসুমে পানি সেচের দরকার হয়।

খ. খরিপ মৌসুম

খরিপ মৌসুমকে পুনরায় ২ ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

১. খরিপ-১

২. খরিপ-২।

খরিপ-১

চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সময়কে (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য জুলাই) খরিপ-১ বলা হয়।

এই সময়কে গ্রীষ্মকালও বলে। এই মৌসুমে তাপমাত্রা বেশি থাকে। মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি হয়। এই মৌসুমে আউশ ধান, পাট, ঢেঁড়স, পুঁইশাক, মিষ্টি কুমড়া, করলা, পটল, কাকরোল, বরবটি ইত্যাদির চাষ হয়। বৃষ্টিপাত কম হলে খরিপ-১ মৌসুমেও পানিসেচের ব্যবস্থা করতে হয়। আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ফল।

খরিপ-২

আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়কে (মধ্য জুন থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর) খরিপ-২ বলা হয়। এই মৌসুমকে বর্ষাকালও বলা হয়। এই মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে এবং তাপমাত্রা মাঝারি মাত্রার হয়। এই মৌসুমে আমন ধান ও বর্ষাকালীন শাকসবজির চাষ হয়। এই মৌসুমে জাম্বুরা (বাতাবি লেবু), তাল, নাবী জাতের আম, কাঁঠাল, আমলকি, জলপাই ইত্যাদি ফল পাওয়া যায়।
বারমাসি সবজি যেমন- লালশাক, বেগুন, ঢেঁড়স ইত্যাদি সারা বছরই জন্মে।

কৃষি আবহাওয়া ও জলবায়ু

ফসল উৎপাদনের জন্য বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বাতাসের আর্দ্রতা, বায়ুর চাপের দৈনন্দিন অবস্থাকে কৃষি আবহাওয়া বলে। বাংলাদেশের ফসল উৎপাদন মূলত কৃষি আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। কৃষি আবহাওয়া বিবেচনা করে কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি আবহাওয়ায় বিভিন্নতা রয়েছে। কৃষি আবহাওয়ার এই বিভিন্নতার কারণেই এক এক অঞ্চলে এক এক রকম ফসল ভালো জন্মে। জলবায়ু ও আবহাওয়ার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ৩টি কৃষি অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

১. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল
২. উত্তর-পূর্বাঞ্চল
৩. দক্ষিণাঞ্চল।

নিচে এসব অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

১. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল

বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র রাজশাহী বিভাগ, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের উত্তরাংশে আর্দ্রতা তুলনামূলকভাবে কম। ধান, গম, আলু, আখ, বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি, আম, কাঁঠাল, কুল, লিচু, তামাক, মরিচ, ডাল ইত্যাদি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য ফসল।

২. উত্তর-পূর্বাঞ্চল

সিলেট, ঢাকার পূর্বাঞ্চল ও চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলে শীতকালে তাপমাত্রা কম থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি। এখানকার প্রধান প্রধান ফসল ধান, পাট, চা, আনারস, তেল ফসল এবং নানা প্রকার শাকসবজি।

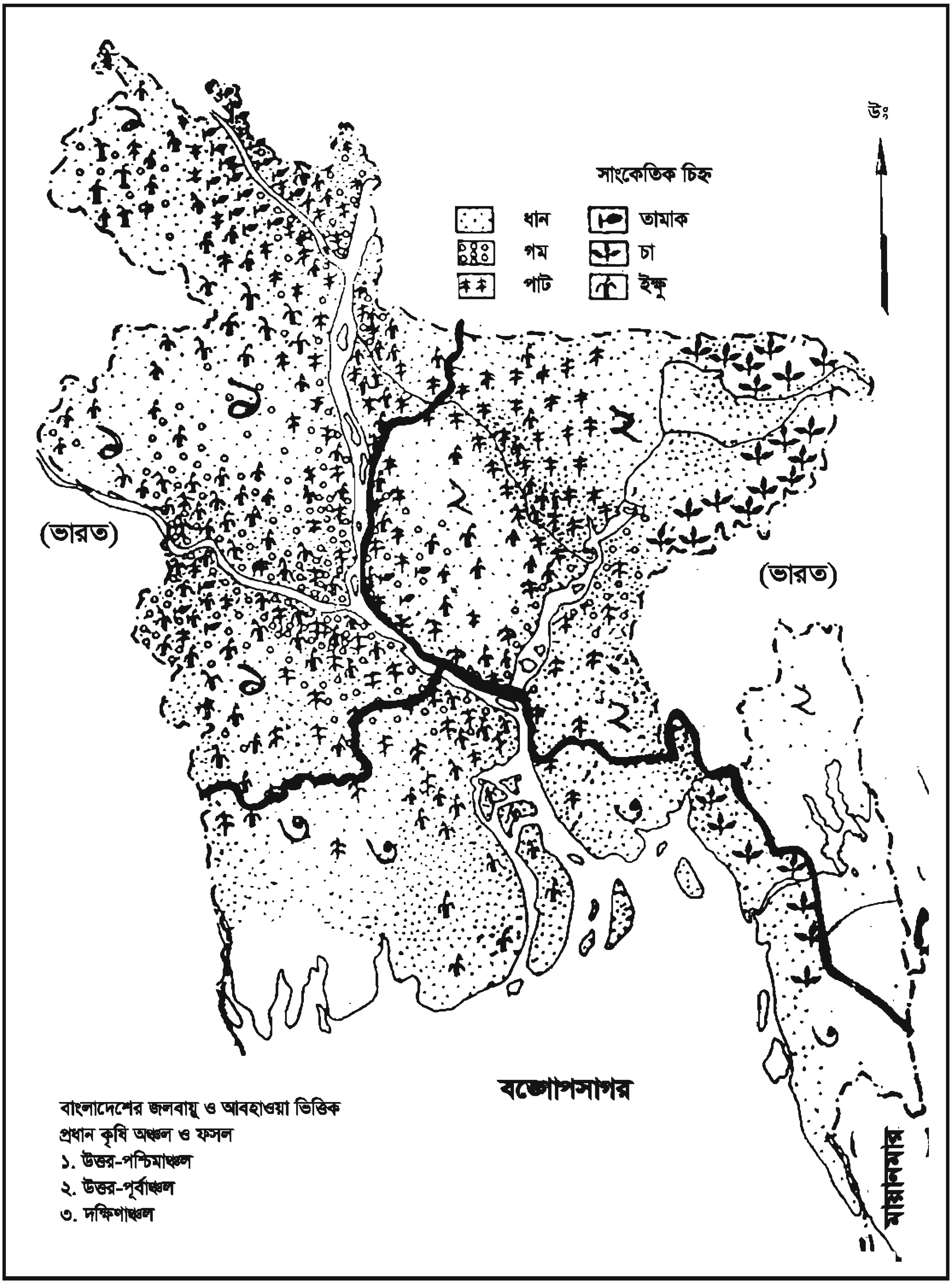

বাংলাদেশের জলবায়ু ও আবহাওয়া ভিত্তিক
প্রধান কৃষি অঞ্চল ও ফসল
১. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল
২. উত্তর-পূর্বাঞ্চল
৩. দক্ষিণাঞ্চল

৩. দক্ষিণাঞ্চল

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলো নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। সমগ্র বরিশাল বিভাগ, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের দক্ষিণাঞ্চল, ঢাকা বিভাগের দক্ষিণের কিছু অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রার তারতম্য তুলনামূলকভাবে কম। সমুদ্রের কাছাকাছি বলে এখানে বাতাসের আর্দ্রতা বেশি। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বেশি। এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান ফসল ধান, ডাল, নারিকেল, পান, সুপারি, কলা, পেঁয়াজ, মরিচ ও আলু।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জলবায়ু কেমন?

ক. চরম ভাবাপন্ন খ. নিরক্ষীয়
গ. ভূমধ্যসাগরীয় ঘ. সমভাবাপন্ন

২. বৃষ্টিপাত বেশি হয় বাংলাদেশের -

i. উত্তর-পূর্বাঞ্চলে
ii. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে
iii. দক্ষিণাঞ্চলে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাবিনা বেগম পড়ন্ত বিকালে গায়ের পথ ধরে হাঁটছিলেন; হঠাৎ ঝড়ো বাতাস আর মেঘের গর্জন শুরু হলে তিনি দৌড়ে নিকটবর্তী একটি স্থানে আশ্রয় নিলেন। এর পরই শুরু হল ব্যাপক শীলাবৃষ্টি।

৩। অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌসুম হল -

i. রবি
ii. খরিপ- ১
iii. খরিপ- ২।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

৪. বর্ণিত মৌসুমে কোন কোন ফসল উৎপাদিত হয়?

ক. ফুলকপি, বাঁধাকপি ও শিম
খ. লালশাক, বেগুন ও ঢেঁড়স
গ. ঢেঁড়স, পুঁইশাক ও মিষ্টিকুমড়া
ঘ. টমেটো, মুলা ও গাজর

সৃজনশীল প্রশ্ন

কৃষিবিদ মি. জাবেদ একদিন গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরে গিয়ে কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে স্থানীয় কৃষি আবহাওয়া ও ফসল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন অঞ্চল ভেদে সামান্য তারতম্য থাকলেও পরিমিত বৃষ্টিপাত, মধ্যম শীতকাল ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃষি আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে এক এক অঞ্চলে এক এক রকম ফসল ভালো জন্মে। তাই তিনি কৃষি আবহাওয়া বিবেচনায় রেখে এলাকার কৃষকদেরকে ফসল উৎপাদনের পরামর্শ দিচ্ছিলেন।

ক. জলবায়ু বলতে কী বোঝ?

খ. ''কৃষি আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে এক এক অঞ্চলে এক এক রকম ফসল ভালো জন্মে'' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. কৃষিবিদ জাবেদ চাঁদপুরের কৃষকদেরকে খরিপ-১ মৌসুমে সম্ভাব্য কোন ফসল চাষ করার পরামর্শ দিচ্ছিলেন? কেন?

ঘ. চাঁদপুরে গম চাষের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মাটি

মাটির ধারণা

মাটি বলতে সাধারণত পৃথিবীর নরম উপরিভাগকে বোঝায়। মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের মতে ভূপৃষ্ঠের যে নরম স্তরে গাছপালা জন্মে ও গাছ পুষ্টি শোষণ করে বড় হয় তাকে মাটি বলে। মাটি বিভিন্ন প্রকার জৈব পদার্থ, অজৈব পদার্থ, পানি ও বায়ু দ্বারা গঠিত।

মাটির গঠন

মাটিকে আমরা এখন যে অবস্থায় দেখছি আদিতে এরূপ ছিল না। মাটির বর্তমান অবস্থা লাভ করতে বহু বছর লেগেছে। সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন একটি উত্তপ্ত গ্যাসপিন্ড রূপে পৃথিবীর সৃষ্টি। এই গ্যাসপিন্ড সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমান্বয়ে ঠান্ডা হয় এবং এর উপরিভাগে অনেক বড় বড় শিলার উৎপাত্তি হয়। এই শিলাগুলো হচ্ছে আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলা। দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় তাপ, ঠান্ডা, তুষারপাত, বায়ুপ্রবাহ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলাগুলো ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পরিণত হয়। আরো পরে গাছপালা ও জীবজন্তুর দেহাবশেষ পচে মাটিতে মিশে কৃষিকার্যের উপযোগী হয়। অতএব, মাটি হচ্ছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শিলাকণা, জৈবকণা, পানি ও বায়ুর সংমিশ্রণে গঠিত একটি মিশ্র পদার্থ।

মাটি গঠনের উপাদান

মাটির উপাদান ৪টি; যথা-

১. খনিজ ও অজৈব পদার্থ	২. জৈব পদার্থ
৩. পানি	৪. বায়ু।

১. খনিজ পদার্থ

সূর্যের তাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে বহু বছর ধরে ভূপৃষ্ঠের আদি শিলা ক্ষয়ীভূত হয়ে খনিজ পদার্থে পরিণত হয়েছে। বালিকণা, কর্দমকণা, পলিকণা হচ্ছে খনিজ পদার্থ। এই সব খনিজ পদার্থ নানাভাবে মিশে মাটির বুনট সৃষ্টি হয়েছে। এক এক শ্রেণীর মাটির বুনট এক এক ফসলের জন্য উপযোগী। মাটির খনিজ কণাগুলো পরস্পর মিলে যৌগিক কণা গঠন-করে একে বলা হয় মাটির দানাবন্ধন বা গঠন। দানাবন্ধন হওয়ার ফলেই মাটি সছিদ্র হয় এবং তাতে সহজে বায়ু ও পানি স্থান করে নিতে পারে। দানাযুক্ত এবং সচ্ছিদ্র মাটি কৃষি কাজের জন্য উপযোগী। মাটিতে শতকরা ৪৫ ভাগ খনিজ পদার্থ থাকে।

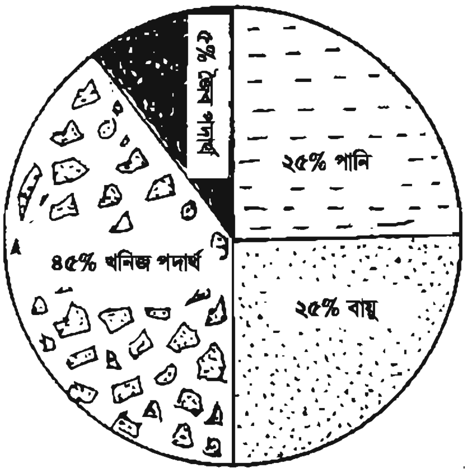

আদর্শ মাটির গঠন উপাদানের পরিমাণ

২. জৈব পদার্থ

মৃত গাছপালা ও জীবজন্তু মাটিতে পচে যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে জৈব পদার্থ বলে। মাটিতে জৈব পদার্থ যুক্ত হলেই মাটির গঠন কাজ সম্পূর্ণ হয়। জৈব পদার্থ মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি করে। যেমন- শক্ত এঁটেল মাটিতে অধিক পরিমাণে জৈব পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটলে মাটি নরম হয় এবং মাটির গঠন উন্নত মানের হয়।

জৈব পদার্থকে মাটির প্রাণ বলা হয়। কারণ, জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে মাটিস্থ অণুজীবগুলো ক্রিয়াশীল হয়। ফলে কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি খাদ্য উপাদান গাছের গ্রহণ উপযোগী হয়। এছাড়া

হিউমাস সৃষ্টি হয়, যা মাটির উর্বরতার জন্য খুবই দরকারি। জৈব পদার্থ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৫ ভাগ।

৩. পানি

পানি মাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাটিস্থ পানি গাছের খাদ্য উপাদানগুলোকে দ্রবীভূত রাখে এবং মাটিকে রসালো রাখে। ফলে গাছপালা শিকড়ের সাহায্যে সেগুলো শোষণ করে নিতে পারে। বৃষ্টির পানি ও সেচের পানিই মাটির পানির প্রধান উৎস। মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে পানি জমা থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় মাটিতে শতকরা ২৫ ভাগ পানি থাকা দরকার।

৪. বায়ু

বায়ু মাটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে বায়ু থাকে। মাটির বায়ুতে বিদ্যমান অক্সিজেন জীবকার্যে লাগে। জমি চাষ দিলে মাটিতে বায়ু চলাচল বাড়ে। মাটিতে বায়ুর পরিমাণ হল শতকরা ২৫ ভাগ।

মাটির প্রকার

মাটির অজৈব অংশ বিভিন্ন প্রকার কণা দ্বারা গঠিত; যথা– মোটা বালিকণা, সূক্ষ্মকণা, পলিকণা ও কর্দমকণা। আন্তর্জাতিক পরিমাপ অনুযায়ী কণাগুলোর আকৃতি নিম্নরূপ-

মাটির কণার নাম	ব্যাস (মিলিমিটার)
মোটা বালিকণা	০.২-২.০
সূক্ষ্ম বালিকণা	০.০২-০.২
পলিকণা	০.০০২-০.০২
কর্দমকণা	০.০০২ এর চেয়ে কম

উল্লিখিত কণাগুলো বিভিন্ন অনুপাতে মিশে মাটির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বুনট সৃষ্টি করে। মাটির বুনটের ওপর ভিত্তি করেই মাটিকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা-
ক. বেলে মাটি খ. দোআঁশ মাটি গ. এঁটেল মাটি

ক. বেলে মাটি

যে মাটিতে শতকরা ৭০ ভাগ বা তারও বেশি বালিকণা থাকে তাকে বেলে মাটি বলে। মরুভূমি চরাঞ্চল ও সমুদ্র উপকূলে বেলে মাটি দেখা যায়। বেলে মাটির কণাগুলো বড় বড়। এই মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম। মাটির ছিদ্র বেশি হওয়ার কারণে পানি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং অধিক পরিমাণে বায়ু চলাচল করে। এতে জৈব পদার্থ নেই। বেলে মাটি কৃষি কাজের উপযোগী নয়। বালির কণা মিহি হলে এবং মাটিতে প্রচুর গোবর, কমপোস্ট, সবুজ সার ইত্যাদি প্রয়োগ করলে চিনা, কাউন, ফুটি, তরমুজ, আলু এসব চাষ করা যায়।

খ. দোআঁশ মাটি

যে মাটিতে বালি, পলি ও কর্দমকণা প্রায় সমান অনুপাতে বিদ্যমান থাকে তাকে দোআঁশ মাটি বলে। তবে আদর্শ দোআঁশ মাটিতে অর্ধেক বালি এবং বাকি অর্ধেক পলি ও কর্দম কণার মিশ্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়। দোআঁশ মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি। এই মাটির পানি শোষণ ও ধারণ ক্ষমতা উভয়ই বেশি। এই মাটি চাষের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এসব কারণে প্রায় সব ধরনের ফসলই এই মাটিতে ভালো জন্মে। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের মাটিই দোআঁশ মাটি। কৃষিক্ষেত্রে দোআঁশ মাটিকে আদর্শ মাটি বলা হয়।

দোআঁশ মাটিকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যেমন-

১. বেলে দোআঁশ মাটি
২. পলি দোআঁশ মাটি
৩. এঁটেল দোআঁশ মাটি।

নিচে বিভিন্ন প্রকারের মাটির পরিচয় দেওয়া হল।

১. বেলে দোআঁশ মাটি

যে দোআঁশ মাটিতে বালিকণার পরিমাণ বেশি থাকে তাকে বেলে দোআঁশ মাটি বলে। তিস্তার অববাহিকায় এই মাটির আধিক্য লক্ষ করা যায়। এই মাটিতে মুলা, তামাক, মরিচ এসব ফসল ভালো জন্মে।

২. পলি দোআঁশ মাটি

যে দোআঁশ মাটিতে পলিকণার পরিমাণ বেশি, তাকে পলি দোআঁশ মাটি বলে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পলি দোআঁশ মাটি দেখা যায়। এই মাটিতে ধান, পাট, গম, আখ, আলু ও শাকসবজি ভালো জন্মে।

৩. এঁটেল দোআঁশ মাটি

যে দোআঁশ মাটিতে কর্দমকণার পরিমাণ বেশি তাকে এঁটেল দোআঁশ মাটি বলে। গঙ্গার অববাহিকা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই মাটিতে ধান, তুলা, গম, ডাল, তেল ফসল ফলন ভালো হয়।

গ. এঁটেল মাটি

যে মাটিতে শতকরা ৪০ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ কর্দম কণা থাকে তাকে এঁটেল মাটি বলে। এঁটেল মাটিকে ভারী মাটিও বলা হয়। এই মাটির সচ্ছিদ্রতা কম। তাই এর পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। কিন্তু নিষ্কাশন ক্ষমতা কম। পানির সংস্পর্শে এঁটেল মাটি খুবই নরম হয় আবার শুকালে খুব শক্ত হয়। প্রচুর জৈব সার প্রয়োগ করে এই মাটিকে দোআঁশ মাটিতে রূপান্তর করা যায়। ধান, পাট, আখ ও শাকসবজি এই মাটিতে ভালো জন্মে।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ মাটির বুনট নির্ধারণ

উপকরণ

মাটি, পাত্র ও পানি।

কাজের ধাপ

১. মাঠ হতে কিছু মাটি সংগ্রহ কর।
২. সংগৃহীত মাটি একটি পাত্রে রেখে গুঁড়া কর।
৩. এক মুঠ গুঁড়া মাটি হাতে নিয়ে পানি মেশাও।
৪. দলা বানাতে চেষ্টা কর।
৫. মাটি যদি দলা না হয় তবে তা হবে বেলে মাটি।
৬. যদি দলা বানানো যায় এবং চ্যাপ্টা করা যায় তাহলে হবে এটেঁল মাটি।
৭. যদি দলাটি চ্যাপ্টা না হয়ে ভেঙে যায় তবে তা হবে দোআঁশ মাটি।
৮. পরীক্ষার প্রতিটি ধাপের ফলাফল ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আদর্শ মাটির উপাদানগুলোর শতকরা অনুপাতের কোন চিত্রটি সঠিক?

ক. খ.

গ. ঘ.

২. মাটিস্থ খনিজ পদার্থের ফাঁকে ফাঁকে থাকে -

i. বায়ু
ii. পানি
iii. জৈব পদার্থ।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দুবলারচরের মোর্শেদ মিয়ার বসতভিটা ছাড়া অন্য কোনো জমি নাই। বসত ভিটায় সে দুটি গাভী পালন করত। তার পাশেই সে এক বিঘা জমি বর্গা নিয়ে আলু চাষ করে। সে গাভীর গোবর ঐ জমিতে ফেলত। হঠাৎ বর্গাজমির মালিক জমিটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিলে মোর্শেদ মিয়া তার গাভী দুটি বিক্রি করে জমিটি কিনে নেয়। পরবর্তীতে ঐ জমিতে ফলন কম হয়।

৩. জমিটির ফলনহ্রাসের কারণ কী?

ক. আগাছা দমন না করা খ. পানি সেচ না দেওয়া
গ. রাসায়নিক সার ব্যবহার না করা ঘ. জৈব সারের ঘাটতি সৃষ্টি হওয়া

৪. এ ক্ষেত্রে মোর্শেদ মিয়ার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?

i. প্রচুর গোবর সার প্রয়োগ করা
ii. সবুজ সার প্রয়োগ করা
iii. রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. দুবলার চরের মাটি প্রধানত-

ক. বেলে খ. বেলে দোআঁশ
গ. এঁটেল দোআঁশ ঘ. এঁটেল

সৃজনশীল প্রশ্ন

গাইবান্ধার মোল্লার চরের ভূমিহীন কৃষক করিম এক বিঘা জমি বর্গা নিয়ে প্রথমে বোরো ধান চাষ করেন। মাটির বুনট অনুকূল না থাকায় তাকে লোকসান গুণতে হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে একই জমিতে তরমুজ চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পান।

ক. মাটি কাকে বলে?
খ. কৃষক করিম কেন ধান চাষ করে ক্ষতিগ্রস্থ হলেন- ব্যাখ্যা কর।
গ. মোল্লার চরের মাটির গঠন ব্যাখ্যা কর।
ঘ. কৃষক করিম বোরো ধান চাষ করে লোকসান গুণল কেন? বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাটির উর্বরতা ও ভূমিক্ষয়

মাটির উর্বরতা

উদ্ভিদ বা ফসলের চাহিদা অনুযায়ী কোনো জমির পুষ্টি উপাদান সরবরাহের সামর্থ্যকে মাটির উর্বরতা বলে। যে জমিতে সকল খাদ্য উপাদান যথাযথ পরিমাণে উপস্থিত থাকে তাকে উর্বর ভূমি বলে। প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে ভূমি অনুর্বর হয়। মাটির উর্বরতা শস্য উৎপাদনের অন্যতম নিয়ন্ত্রক। মাটির উর্বরতার নিয়ন্ত্রকগুলো হল।

১. খনিজ পদার্থ

আদি শিলা ভেঙে যে খনিজ পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে তাতে গাছের সবগুলো পুষ্টি উপাদানই রয়েছে। এই পুষ্টিগুলো গ্রহণ করে গাছ বড় হয়, ফুল ও ফল উৎপাদন করে।

২. জৈব পদার্থ

মাটিতে গাছপালা, জীবজন্তুর বিষ্ঠা ও মৃতদেহ পচে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। জৈব পদার্থ মাটিতে মিশে ফসলের খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে।

৩. ভূমির বন্ধুরতা

ভূমির বন্ধুরতার কারণে বৃষ্টিপাতের জন্য পাহাড়ের ঢালু জায়গা ও তলদেশের মাটি বেশি উর্বর হয়।

৪. জমি চাষ

জমি ভালোভাবে চাষ করলে মাটি ঝুরঝুরে হয় এবং নরম হয়। এতে জৈব পদার্থ ও সার মাটির সর্বত্র সমভাবে মিশ্রিত হয়। এর ফলে গাছ সহজে মাটিতে শিকড় বিস্তার করতে পারে ও খাদ্য উপাদান শোষণ করে নিতে পারে। পরিণামে মাটির উর্বরতা বাড়ে।

৫. পানি সেচ

জমিতে পানি সেচ দিলে মাটি রসালো হয় এবং খাদ্য উপাদানগুলো ফসল সহজে গ্রহণ করতে পারে।

৬. জৈব সার প্রয়োগ

মাটিতে জৈব সার প্রয়োগ করলে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি মাটিতে যুক্ত হয়। আর অণুজীবগুলো ক্রিয়াশীল হয়। ফলে মাটি উর্বর হয়।

৭. রাসায়নিক সার প্রয়োগ

অবিরাম ফসল উৎপাদনের ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়। ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি ইত্যাদি রাসায়নিক সার হিসেবে জমিতে দেওয়া হয়। এই সারগুলো প্রয়োগের ফলে যথাক্রমে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ মাটিতে যুক্ত হয়।

কমপোস্ট সার ও সবুজ সার তৈরি

কমপোস্ট সার তৈরি

গবাদি পশুর উচ্ছিষ্ট, খড়কুটা, বিভিন্ন প্রকার কৃষিবর্জ্য, আগাছা, কচুরিপানা প্রভৃতি খামার প্রাঙ্গণে স্তরে স্তরে সাজিয়ে অণুজীবের সাহায্যে পচিয়ে যে সার তৈরি করা হয় তাকে কমপোস্ট সার বলা হয়। অনেকগুলো জিনিস একত্রে পচিয়ে

কমপোস্ট প্রস্তুত করা যায়। আবার একটি মাত্র উপাদান দ্বারাও তৈরি করা যায়। দুটি পদ্ধতিতে কমপোস্ট সার প্রস্তুত করা যায়; যথা-

১. স্তূপ পদ্ধতি ও ২. পরিখা পদ্ধতি

নিম্নে কমপোস্ট তৈরির দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

স্তূপ পদ্ধতি

স্তূপ পদ্ধতিতে কমপোস্ট সার তৈরির জন্য এমন একটি উঁচু জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে পানি জমে না। গোয়াল ঘরের পাশে বা খামার প্রাঙ্গণে জায়গা নির্বাচন করা ভালো। গাছতলায়ও কমপোস্ট সার তৈরি করা যায়।

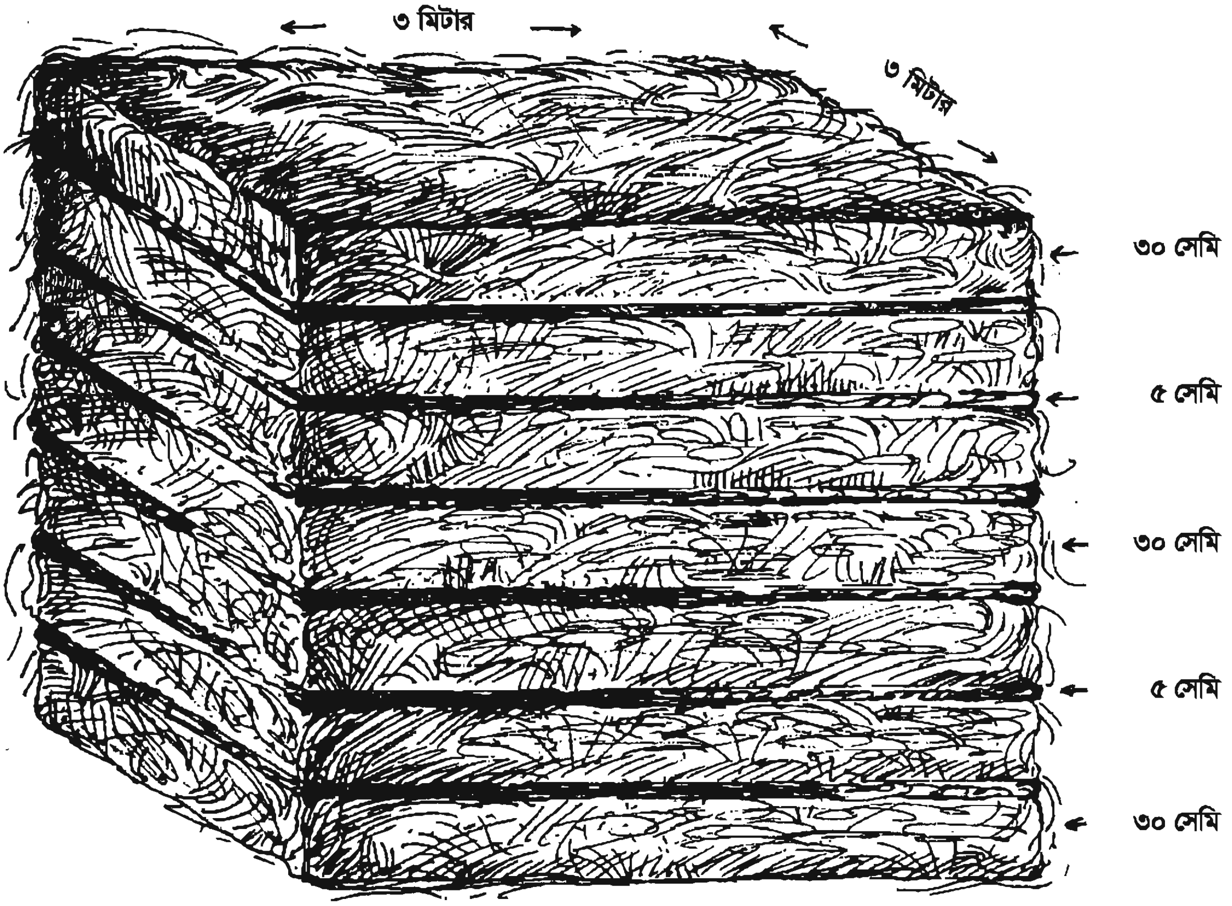

কমপোস্ট স্তূপের স্তরবিন্যাস

প্রথমে ৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২ মিটার প্রস্থ পরিমিত জায়গা মেপে নিতে হবে। চার কোনায় চারটি খুঁটি পুঁতে চতুর্দিকে রশি জড়িয়ে আয়তকার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। ক্ষেত্রের ভেতরে খড়কুটা, আবর্জনা, আগাছা ইত্যাদি কমপোস্ট তৈরির কাঁচামাল স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি স্তর ৩০ সেমি উঁচু হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কমপোস্ট তৈরির জিনিসগুলো সেখানে রাখতে হবে। প্রথম স্তরটি ৩০ সেমি উঁচু হলে ১ কেজি গুঁড়া খৈল, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০০ গ্রাম টিএসপি ছিটাতে হবে। পরবর্তীতে ২ কেজি বায়ো এক্টিভেটর ছিটিয়ে দিতে হবে। পরে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। এতে আর্বজনার স্তরটি আঁটসাট হবে এবং পচনক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। তারপর স্তরটির উপর ৫ সেমি পরিমাণ পুরু করে গোবরের লেপ দিতে হবে। এভাবে ৭টি স্তর সাজাতে হবে।

সপ্তম স্তরটি কুঁড়ে ঘরের চালার মতো করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি স্তূপের ভেতর প্রবেশ না করে গড়িয়ে নিচে পড়তে পারে। স্তূপ পলিথিন দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। নিচের ছকে বায়ো এক্টিভেটর তৈরির উপাদান ও পরিমাণ উল্লেখ করা হল।

কমপোস্ট এক্টিভেটর	**পরিমাণ**
১। ছত্রাক ইনোকুলাম দ্রব্য	১ কেজি
২। শুকনো গুঁড়া গোবর	৭ কেজি
৩। খৈল গুঁড়া	৫ কেজি
৪। ইউরিয়া	৪ কেজি
৫। টিএসপি	১ কেজি
৬। এমপি	১ কেজি
৭। পাতা পচা মাটি	১ কেজি
মোট	**২০ কেজি**

কমপোস্ট সার দেড় দুই মাসের মধ্যে জমিতে ব্যবহারের উপযোগী হয়। কমপোস্টের প্রত্যেকটি স্তরের জিনিসগুলো যাতে সমানভাবে পচে সেজন্য ১ মাসের মধ্যে স্তরগুলো ওলট পালট করে দিতে হবে। স্তর উল্টিয়ে উপরের স্তর নিচে এবং নিচের স্তর উপরে দিতে হবে। আবর্জনার স্তর ওলট-পালটের পর পরবর্তী মাসের মধ্যে সঠিকভাবে পচবে ও কমপোস্টে পরিণত হবে।

পরিখা পদ্ধতি

প্রথমে একটি উঁচু স্থান নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত স্থানে ৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২ মিটার প্রস্থ ১.২ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট পরিখা খনন করতে হবে। এরূপ ৬টি পরিখা পাশাপাশি খনন করতে হবে। পরিখার উপর চালার ব্যবস্থা করতে হবে। পাঁচটি পরিখা স্তূপ পদ্ধতির ন্যায় আবর্জনা, খড়কুটা, গোবর দিয়ে পর্যায়ক্রমে সাজাতে হবে। প্রতিটি পরিখার আবর্জনার স্তূপ ভূপৃষ্ঠ হতে ৩০ সেমি উঁচু হবে। একটি পরিখা খালি থাকবে। চার সপ্তাহ পর নিকটবর্তী পরিখার কমপোস্ট খালি পরিখায় স্থানান্তর করতে হবে। এভাবে কমপোস্টের উপাদানগুলো ওলটপালট হবে ও পচন ক্রিয়াও ত্বরান্বিত হবে। ২-৩ মাসের মধ্যে উপাদানগুলো সম্পূর্ণ পচে কমপোস্ট তৈরি হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে সারা বছর কমপোস্ট তৈরি করা যেতে পারে।

কমপোস্ট সারের উপকারিতা

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে এই সার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমপোস্ট সার ব্যবহারের ফলে মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম যুক্ত হয়। তাছাড়াও কমপোস্ট মাটির গঠন ও বুনটের উন্নয়ন করে ফসল উৎপাদনের উপযোগী করে তোলে। ফলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও বায়ু চলাচল বাড়ে। কমপোস্ট সার প্রস্তুত করতে খরচ কম হয়। এজন্য এ সার ব্যবহার বেশ লাভজনক।

সবুজ সার প্রস্তুত পদ্ধতি

জমিতে যে কোনো সবুজ উদ্ভিদ জন্মিয়ে কচি অবস্থায় জমি চাষ করে মাটির নিচে ফেলে পচিয়ে যে সার প্রস্তুত করা হয় তাকে সবুজ সার বলে। ধইঞ্চা, গোমটর, শণ, কালাই এসবের চাষ করে ফুল আসার আগে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মেশালে তা পচতে শুরু করে। তারপর আরও ৩-৪ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ওলটপালট করে মাটির সাথে ভালোভাবে মেশালে ২ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পচে যায়। সবুজ সারের সুবিধা এই যে যেখানে এই সার তৈরি হয় সেখানেই এর ব্যবহার হয়।

ধইঞ্চার চাষ ও সার প্রস্তুত

ধইঞ্চা চাষের জন্য যে কোনো জমি নির্বাচন করা যেতে পারে। দু একটি চাষ দিয়ে শতক প্রতি ৭০ গ্রাম ফসফেট ও ৫০ গ্রাম পটাশ ছিটাতে হবে। এরপর শতক প্রতি ২০০ গ্রাম বীজ বুনলে খুব ঘন হয়ে চারা গজাবে। বীজ বপনের প্রায় আড়াই মাসের মধ্যে গাছে ফুল আসা শুরু করলে লাঙল দ্বারা গাছগুলো মাটির নিচে ফেলতে হবে। গাছ লম্বা হলে কাস্তে বা দা দিয়ে কেটে ছোট করে জমি চাষ করতে হবে।

পচন শুরু হলে ২ সপ্তাহ পর পর ৩টি চাষ দিলে ধইঞ্চার গাছ সম্পূর্ণভাবে পচে সারে পরিণত হবে। সবুজ সার হতে প্রতি শতকে ৩৫০ গ্রাম হতে ৪৫০ গ্রাম নাইট্রোজেন যুক্ত হয় এবং ১২ কেজি হতে ১০০ কেজি পর্যন্ত জৈব পদার্থ যুক্ত হয়।

সবুজ সারের উপকারিতা : সবুজ সার মাটির উর্বরতা রক্ষায় অনেক উপকার করে। যেমন-

১. সবুজ সার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং উৎপাদন শক্তিও বাড়ায়।
২. সবুজ সার মাটিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব পদার্থ যোগ করে।
৩. সবুজ সার মাটিতে নাইট্রোজেন বাড়ায়।
৪. সবুজ সার প্রয়োগের ফলে মাটিস্থ অণুজীবগুলো ক্রিয়াশীল হয়।
৫. সবুজ সার মাটিস্থ পুষ্টি উপাদান সংরক্ষণ করে।

ভূমিক্ষয় ও ভূমি সংরক্ষণ

পানি প্রবাহ, বায়ু ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের মাটি অন্যত্র চলে যাওয়াকে ভূমিক্ষয় বলে। কৃষি জমির ১৫-২০ সেমি নিচ পর্যন্ত উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান সঞ্চিত থাকে। ভূমিক্ষয়ের ফলে এই পুষ্টি উপাদানগুলো সরে যায়। ফলে কৃষি জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

ভূমিক্ষয়ের প্রকার

প্রধানত দুই প্রকারে ভূমিক্ষয় হয়; যথা-

ক. পানি ভূমিক্ষয় ও
খ. বায়ু ভূমিক্ষয়।

ক. পানি ভূমিক্ষয়

পানি প্রবাহের কারণে যে ভূমিক্ষয় হয় তাকে পানি ভূমিক্ষয় বলে। পানি ভূমিক্ষয় নিম্নরূপ হয়ে থাকে।

১. **আস্তরণ ভূমিক্ষয় :** বৃষ্টির পানি বা সেচের পানির প্রবাহের ঢালযুক্ত জমি হতে মাটির উপরিভাগের যে নরম আস্তরণ সরে যায় তাকে আস্তরণ ভূমিক্ষয় বলে। ঢালু জমিতে আস্তরণ ভূমিক্ষয় বেশি। সমতল জমিতে এরূপ ভূমিক্ষয়ের মাত্রা কম।

২. **রিল ভূমিক্ষয় :** রিল ভূমিক্ষয় আস্তরণ ভূমিক্ষয়ের দ্বিতীয় পর্যায়। পানি প্রবাহ বেশি হলে জমির উপর হাতের রেখার মতো ছোট ছোট লম্বা রেখার সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে রেখাগুলো ছোট ছোট নালায় পরিণত হয়। একে রিল ভূমিক্ষয় বলে।

৩. **নালা ভূমিক্ষয় :** নালা ভূমিক্ষয় রিল ভূমিক্ষয়ের পরের পর্যায়। রিল ভূমিক্ষয়ের ফলে যে ছোট নালার সৃষ্টি হয় তা বিরামহীন চলতে থাকলে কালক্রমে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় বড় হয়ে নালায় পরিণত হয় এবং নালা ভূমিক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। জমির অবস্থা এরূপ হলে এর উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।

৪. **নদীকূলের ভূমিক্ষয় :** প্রবল স্রোতে নদী তীরের জমি ভেঙে নদীগর্ভে বিলীন হওয়াকে নদীকূলের ভূমিক্ষয় বলে। প্লাবনের শুরু ও শেষে এ ভাঙনের তীব্রতা বেশি হয়। নদী ভাঙনের ফলে প্রতি বছর অনেক কৃষক জমি ও বাড়ি ঘর হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

৫. **সাগরকূলের ভূমিক্ষয় :** সমুদ্র উপকূলের মাটি জলোচ্ছ্বাস ও সাগরের ঢেউ এবং জলোচ্ছ্বাসের প্রবল আঘাতে ভেঙে সাগর বক্ষে বিলীন হয়। উপকূলীয় এলাকা ও সাগরবক্ষের দ্বীপগুলোয় এরূপ ভূমিক্ষয় হয়।

খ. বায়ু ভূমিক্ষয়

পানি প্রবাহের মতো বায়ু প্রবাহেও ভূমিক্ষয় হয়। ঝড়ো গতির বায়ু এক স্থানের মাটি অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করে। বায়ু প্রবাহ দ্বারা মরুভূমির বালি মাটি শত শত মাইল দূরে এসে উর্বর ভূমি অনুর্বর করে ফেলে।

ভূমিক্ষয়ের কারণ

ভূমিক্ষয়ের কারণগুলো হচ্ছে-

১. অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত
২. ঢালু জমি
৩. মাটির প্রকৃতি
৪. চাষ পদ্ধতি
৫. বায়ু প্রবাহ
৬. মানুষের কার্যাবলি।

১. অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত

মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলে মাটিতে সজোরে আঘাত লাগে। এর ফলে মাটির কণা সহজে ভেঙে যায়। দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি হলে মাটি পানি শোষণ ক্ষমতা হারায়। ফলে অতিরিক্ত পানি মাটির উপর দিয়ে নিচের দিকে গড়ায়। এই পানির সাথে জমির উর্বর মাটি চলে যায়।

২. ঢালু জমি

ঢালু জমির মাটি তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়। বৃষ্টির পানি দ্রুত নিচের দিকে নামার ফলে সহজেই উপরের স্তরের মাটির বিচ্যুতি ঘটে।

৩. মাটির প্রকৃতি

এঁটেল বা কাদা মাটি ভারী বলে এর সচ্ছিদ্রতা কম। তাই এরূপ মাটির পানি শোষণ ক্ষমতাও কম। অল্প বৃষ্টিতেই পানি জমে যায়। আর মাটির উপরিভাগের মাটি নিচের দিকে গড়ায়। পক্ষান্তরে জৈব পদার্থযুক্ত সচ্ছিদ্র মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা বেশি বলে ভূমিক্ষয়ও কম।

৪. চাষ পদ্ধতি

ক. কম শিকড় বিশিষ্ট ফসল চাষ করলে ভূমিক্ষয় বেশি হয়।
খ. পাহাড়ি জমিতে ঢালের বরাবর চাষ করলে ভূমিক্ষয় বেশি হয়।
গ. জমি ঘন ঘন চাষ করলেও পানি ও বায়ুর প্রভাবে ভূমিক্ষয় হয়।

৫. বায়ু

বায়ু প্রবাহের প্রভাবে মাটির উপরিভাগ ক্ষয় হয়ে যায়।

৬. মানুষের কার্যাবলি

বনজঙ্গল প্রকৃতির দান। মানুষ অবিবেচকের মতো এই বনজঙ্গল উজাড় করে ফেলছে। ফলে মাটি সহজেই স্থানান্তর হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

ভূমিক্ষয়ের অপকারিতা

মাটির উপরিভাগের ১৫-২০ সেমি গভীর পর্যন্ত গাছের পুষ্টি ও মাটির উর্বরতা মজুদ থাকে। ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির এই উপরিভাগ অন্যত্র অপসারিত হয়। এর সাথে মাটির উর্বরতা ও গাছের পুষ্টি চলে যায়। এভাবে ক্রমশ মাটি উর্বরতা হারাতে থাকে। একসময় মাটি চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

ক্রমাগত ভূমিক্ষয়ের ফলে নদীনালা, খালবিল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নদীতে চর জেগে উঠেছে। এর ফলে প্রায়ই বন্যা হয় এবং শুকনো মৌসুমে নৌ চলাচলের অসুবিধা হয়।

ভূমি সংরক্ষণ

দীর্ঘদিন ধরে ভূমিক্ষয় হতে থাকলে কৃষি জমির বিলুপ্তি ঘটার আশঙ্কা আছে। তাই বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করে ভূমি সংরক্ষণ করা দরকার।

নিম্নে ভূমি সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১। পানি প্রবাহের বেগ কমানো

বৃষ্টির পানির বেগ কমিয়ে ভূমি সংরক্ষণ করা যায়। পানির বেগ কমানোর উপায়গুলো হচ্ছে।

ক. জমিতে পানি প্রবাহের দিকে বাঁধ বা আইল দেওয়া।

খ. ছোট ছোট নালা সমান করে দেওয়া।

গ. বড় বড় নালায় আগাছা জন্মানো এবং শেষ প্রান্তে তারের জাল দেওয়া।

উল্লিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করলে নালাগুলো ভরাট হয়ে জমি সমান হবে।

২. পানি নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করা

বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ভালো বন্দোবস্ত করে ভূমি সংরক্ষণ করা যায়। এজন্য বৃষ্টির পানি সরার জন্য মাটির নিম্নস্তরে টাইল নালা করে দিতে হবে যাতে পানি ধীর গতিতে সরে যায়।

৩. জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা

জমিতে অধিক পরিমাণে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করলে মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা বাড়ে। ফলে কম পরিমাণ পানি নিচের দিকে গড়ায়। অর্থাৎ জৈব পদার্থের ব্যবহার বৃদ্ধি করলে ভূমি সংরক্ষণ হয়।

৪. ধাপে চাষ করা

পাহাড়ি অঞ্চলের ঢালু জমি ধাপ করে কেটে কেটে চাষ করলে বৃষ্টির পানি দ্রুত বেগে গড়াতে পারে না। এভাবে পাহাড়ি জমির মাটি সংরক্ষণ করা যায়।

৫. কন্টোর পদ্ধতিতে চাষ করা

পাহাড়ের ঢালের আড়াআড়ি লাইনে চাষ করার নাম কন্টোর পদ্ধতি। দীর্ঘস্থায়ী ফসল এই পদ্ধতিতে চাষ করলে ভূমি সংরক্ষণ হয়।

৬. জমিকে খন্ড খন্ড করে চাষ করা

এ পদ্ধতিতে পাহাড়ের গায়ে আড়াআড়িভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি তৈরি করে এক একটি অংশে এক এক ফসল জন্মালে ভূমিক্ষয় রোধ হয়।

৭. বনজঙ্গল সৃষ্টি করা

বনজঙ্গল সৃষ্টি করে পানি ও বাতাসের গতিরোধ করা যায়। এতেও ভূমিক্ষয় রোধ হয়।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ কমপোস্ট সার তৈরি

উপকরণ

১. আবর্জনা ২. গোবর ৩. ইউরিয়া ৪. টিএসপি ৫. কাদা মাটি ৬. পানি ৭. ফিতা ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. বিদ্যালয়ের পাশে একটি উঁচু জায়গা নির্বাচন কর।
২. জায়গাটি হতে ৩ মিটার দীর্ঘ এবং ২ মিটার প্রস্থ স্থান ফিতা দিয়ে মেপে নাও।
৩. মেপে নেওয়া স্থানটির চার কোনায় চারটি খুঁটি দিয়ে চিহ্নিত কর।
৪. চতুর্দিকে রশি জড়িয়ে চিহ্নিত স্থানটি আয়তকার ক্ষেত্র বানাও।
৫. তারপর আবর্জনা, খড়কুটা, আগাছা ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্য ফেলে ৩০ সেমি উঁচু স্তর বানাও।
৬. প্রথম স্তর সম্পন্ন হলে আবর্জনার উপর ১ কেজি গুঁড়া খৈল, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০০ গ্রাম টিএসপি ছিটিয়ে দাও। অথবা প্রতি স্তরে ২ কেজি করে এক্টিভেটর ছিটিয়ে দাও।
৭. এরপর পানি দিয়ে স্তরটি ভিজিয়ে দাও।

৮. তারপর ৩ সেমি পুরু করে গোবরের প্রলেপ দাও। পরিবর্তে আরো ১ কেজি এক্টিভেটর ছিটিয়ে দাও।

৯. এভাবে ৭টি স্তর সাজাও। প্রতিটি স্তরের উপরিভাগে একই হারে ইউরিয়া ও টিএসপি এক্টিভেটর ছিটাও বা গোবরের প্রলেপ দাও।

১০. সপ্তম স্তরটি কুঁড়েঘরের চালার মতো বানাও এবং পলিথিন দিয়ে ঢেকে দাও।

১১. স্তূপে নিয়মিত পানি দাও।

১২. তাড়াতাড়ি পচনের জন্য একমাস পর কমপোস্ট উল্টে দাও। স্তূপ উল্টানোর সময় স্তরে স্তরে মোট ১০ কেজি এক্টিভেটর দাও।

১৩. দেড় দুই মাসের মধ্যে কমপোস্ট তৈরি হবে। স্তূপ ভেঙে শুকিয়ে গুঁড়া করে বস্তায় ভরে রাখ। কমপোস্ট তৈরির ধাপগুলো অনুশীলন কর ও ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সবুজ সার তৈরিতে ধইঞ্চার চাষ করা হয়; কারণ-

i. ধইঞ্চার পাতা বেশি সবুজ থাকে

ii. চাষ দিয়ে মাটিতে মিশালে দ্রুত পচে

iii. মাটিতে নাইট্রোজেন যুক্ত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ভূমিক্ষয় মাটির উর্বরতা হ্রাসের অন্যতম কারণ। আমাদের দেশে যে ধরনের ভূমিক্ষয় হয় তার মধ্যে নদী ও সাগরকূলের ভূমিক্ষয় রোধ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় পাহাড়ি ভূমিক্ষয় সহজেই রোধ করা যায়।

২. পাহাড়ি ভূমিক্ষয় রোধের উপায় কোনটি?

ক. পাহাড়ের ঢালে রাবার চাষ করে খ. পাহাড়ের ঢালে আড়াআড়ি চাষ করে

গ. কম শিকড় বিশিষ্ট ফসল চাষ করে ঘ. জমি ঘন ঘন চাষ করে।

৩. কর্ণফুলী নদী পাড়ের জমিতে কোন ধরনের ভূমিক্ষয় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

ক. রিল ভূমিক্ষয় খ. সাগরকূলের ভূমিক্ষয়

গ. নদীকূলের ভূমিক্ষয় ঘ. নালা ভূমিক্ষয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

গণি মিয়ার বিশাল জোত জমি। প্রতি বছর বর্ষার শেষে তার জমি প্রায় একমাস পতিত থাকে। চাষের কাজে সে ২০টি বলদ পালন করে। এছাড়াও ১৫-১৬ জন শ্রমিক/কামলা তার বাড়িতে সব সময় কাজ করে। পরিবারের গৃহস্থালি বর্জ্য ও গো-বর্জ্যের কারণে তার বাড়ির পরিবেশ নোংরা থাকে। ইদানিং প্রচুর রাসায়নিক সার ব্যবহার করেও ভালো ফলন না পাওয়ায় তিনি স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার নিকট পরামর্শ করতে গেলে কৃষি কর্মকর্তা তাকে সবুজ সার ও কমপোস্ট সার ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

ক. কমপোস্ট সার কী?

খ. গণি মিয়ার কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে কেন?

গ. গণি মিয়া কীভাবে সবুজ সার উৎপাদন করতে পারে? বর্ণনা কর।

ঘ. গণি মিয়ার জন্য কমপোস্ট সার ব্যবহারের সুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য মাটি, বায়ু ও পানি হতে যে সব পদার্থ শোষণ করে ঐগুলোকে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলা হয়। মাটিতে উদ্ভিদের পুষ্টির অভাব হলে উদ্ভিদ সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে পারে না। লাভজনকভাবে অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য সার প্রয়োগ করে কৃত্রিমভাবে পুষ্টির অভাব পূরণ করা দরকার। মাটিতে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কী পরিমাণে আছে তা উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পাতা, কাণ্ড ও ফলন দেখে বোঝা যায়। এছাড়া রাসায়নিকভাবে মাটি পরীক্ষা করেও পুষ্টির অবস্থা জানা যায়। উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য পুষ্টির শ্রেণীবিভাগ, কোন পুষ্টি কী কাজ করে, পুষ্টির অভাব হলে কী কী লক্ষণ দেখা দেয় এসব বিষয় সম্পর্কে জানা দরকার।

পুষ্টির শ্রেণীবিভাগ

উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান ১৭টি। যথা- কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, কপার, দস্তা, বোরন, কোবাল্ট ও ক্লোরিন। এই পুষ্টি উপাদানগুলোকে উদ্ভিদের গ্রহণমাত্রার ওপর ভিত্তি করে ২টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে; যথা-

১. মুখ্য পুষ্টি উপাদান
২. গৌণ পুষ্টি উপাদান

১. মুখ্য পুষ্টি উপাদান

যে সব পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য বেশি পরিমাণে প্রয়োজন সে সব পুষ্টি উপাদানকে মুখ্য পুষ্টি উপাদান বলে। মুখ্য পুষ্টি উপাদান ৯টি; যথা- ১. কার্বন ২. হাইড্রোজেন ৩. অক্সিজেন ৪. নাইট্রোজেন ৫. ফসফরাস ৬. পটাশিয়াম ৭. ক্যালসিয়াম ৮. ম্যাগনেসিয়াম ৯. সালফার।

২. গৌণ পুষ্টি উপাদান

যে সব পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের অল্পমাত্রায় প্রয়োজন হয় সে সব পুষ্টি উপাদানকে গৌণ পুষ্টি উপাদান বলা হয়। গৌণ পুষ্টি উপাদান ৮টি; যথা- ১. লৌহ ৫. ম্যাঙ্গানিজ ২. মলিবডেনাম ৬. তামা ৩. দস্তা ৭. বোরন ৪. কোবাল্ট ৮. ক্লোরিন এই উপাদানগুলো অল্পমাত্রায় প্রয়োজন হলেও উদ্ভিদের জীবন রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক।

পুষ্টি উপাদানের উৎস

উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের উৎস ২টি; যথা-

১. প্রাকৃতিক উৎস
২. কৃত্রিম উৎস।

মাটি, বায়ু ও পানি এই তিনটি হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস। জৈব ও রাসায়নিক সার হচ্ছে কৃত্রিম উৎস।

প্রাকৃতিক উৎস

ক. মাটি

কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ব্যতীত বাকি ১৪টি পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদ মাটি থেকে পেয়ে থাকে।

খ. বায়ু

উদ্ভিদ কার্বন ও অক্সিজেন বায়ু হতে গ্রহণ করে।

গ. পানি

উদ্ভিদ পানি হতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পায়। এছাড়া পানিতে অনেক খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে যা উদ্ভিদ গ্রহণ করে।

কৃত্রিম উৎস

ক. জৈব সার

উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের সবগুলোই জৈব সারে পাওয়া যায়। গোবর, কমপোস্ট, আবর্জনা, খড়কুটা ও আগাছা পচিয়ে জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খ. রাসায়নিক সার

ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি ইত্যাদি রাসায়নিক সার। রাসায়নিক সার উদ্ভিদের প্রাথমিক পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম সরবরাহ করে।

পুষ্টি উপাদানের কাজ

উদ্ভিদের জীবনচক্রে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন কাজ করে থাকে। কোনো পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের বর্ধন ক্রিয়ায় সাহায্য করে, কোনোটি রোগ প্রতিরোধ করে আবার কোনোটি বীজ পরিপক্ব করে। আবার কোনোটি অন্য পুষ্টি উপাদান পরিশোষণে সহায়তা করে। এ সকল কাজের সম্মিলিত প্রভাবের ফলে ফসলের ফলন ও গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। পুষ্টি উপাদানগুলোর উপকারী প্রভাব যেমন আছে তেমনি ক্ষতিকর প্রভাবও রয়েছে। পুষ্টি উপাদান পরিমিত পরিমাণে প্রয়োগ করা হলে উপকারী প্রভাব দেখা যায়। অন্যদিকে প্রয়োগ বেশি বা কম হলে ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায়। নিম্নে উদ্ভিদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানের কার্যাবলি বর্ণনা করা হল।

নাইট্রোজেন

উদ্ভিদের জীবনচক্রে নাইট্রোজেনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশে নাইট্রোজেন জাতীয় সার হিসেবে ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়। ইউরিয়ায় শতকরা প্রায় ৪৬ ভাগ নাইট্রোজেন আছে।

নাইট্রোজেনের কাজ

১. গাছকে ঘন সবুজ রাখে।
২. উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ, বিপাক ও শ্বসন কাজে সহায়তা করে।
৩. গাছের পাতা, কাণ্ড ও ডালপালার বৃদ্ধি ঘটায়।
৪. দানা জাতীয় শস্য, গোখাদ্য ও পাতা জাতীয় শাকসবজির গুণগতমান বৃদ্ধি করে।
৫. দানা জাতীয় গাছে কুশি গজাতে সাহায্য করে।

ফসফরাস

ট্রিপল সুপার ফসফেট ও ডাই এমোনিয়াম ফসফেট উল্লেখযোগ্য ফসফেট জাতীয় সার। টিএসপি সারে শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ ফসফেট থাকে।

ফসফরাসের কাজ

১. উদ্ভিদের কোষ বিভাজন ক্রিয়ায় অংশ নেয়
২. উদ্ভিদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে
৩. উদ্ভিদের শিকড় গঠনে সাহায্য করে
৪. সময়মতো ফুল ফোটায় ও ফসল পাকায়
৫. ফসলের গুণগতমান বাড়ায়
৬. গাছকে শক্তি যোগায়।

পটাশিয়াম

মিউরেট অব পটাশ (এমপি) পটাশিয়াম জাতীয় সারের মধ্যে অন্যতম। এই সারে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ পটাশ থাকে।

পটাসিয়ামের কাজ

১. উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
২. উদ্ভিদের কোষ বিভাজনে সহায়তা করে।
৩. উদ্ভিদের পাতায় শর্করা উৎপাদনে সহায়তা করে।
৪. উদ্ভিদের অভ্যন্তরে শর্করা ও রাসায়নিক পদার্থ চলাচলের ব্যবস্থা করে।
৫. উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ও ফসফরাস শোষণে সাম্য রক্ষা করে।

সালফার

ক্যালসিয়াম সালফেট বা জিপসাম সালফার জাতীয় সারের মধ্যে অন্যতম। এই সারে শতকরা ১৪ ভাগ সালফার আছে।

সালফারের কাজ

১. তেল জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
২. শিম জাতীয় ফসলের মূলে নাইট্রোজেন গুটি উৎপাদনে সাহায্য করে।

দস্তা বা জিংক

জিংক সালফেট অন্যতম দস্তা জাতীয় সার। এই সারে শতকরা ৩৬ ভাগ দস্তা ও ১৭ ভাগ সালফার আছে।

দস্তার কাজ

১. গাছের বৃদ্ধি ও আমিষ গঠনে সহায়তা করে।
২. ফুল ও ফল উৎপাদনের সহায়তা করে।

ক্যালসিয়াম

জিপসাম বা ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়ামের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রায় শতকরা ২২ ভাগ।

ক্যালসিয়ামের কাজ

১. উদ্ভিদ কোষের প্রাচীর শক্ত করে।
২. উদ্ভিদের মূল গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
৩. উদ্ভিদ কোষকে শক্তি ও স্থিতিস্থাপকতা প্রদান করে।
৪. ডাল জাতীয় ফসলের ফলন বাড়ায়।

লৌহ

ফেরাস সালফেট লৌহ জাতীয় সারের মধ্যে প্রধান। এই সার মাটিতে কিংবা গাছের পাতায় ব্যবহার করা যায়।

লৌহের কাজ

১. উদ্ভিদের সবুজ কণা গঠন করে।
২. নাইট্রোজেন শোষণে সাহায্য করে।
৩. বিভিন্ন প্রকার জারক রসকে ক্রিয়াশীল রাখার জন্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ

পুষ্টি উপাদানের অভাব ঘটলে উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতার গঠন ও আকৃতিতে নানা প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। নিচে কোন পুষ্টির অভাবে গাছে কী কী লক্ষণ দেখা যায় তা আলোচনা করা হল।

নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণ

১. গাছের পাতা প্রথমে হালকা সবুজ বর্ণ ধারণ করে।
২. অভাব প্রকট হলে হলদে বর্ণ ধারণ করে। হলদে বর্ণ গাছের নিচের পাতা থেকে শুরু হয়।
৩. উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৪. দানা জাতীয় ফসলের কুশি কম হয়।
৫. ফলন অনেক কম হয়।
৬. বীজ অপুষ্ট হয়।
৭. ফলগাছের পাতা ঝরে যায়।
৮. পার্শ্ব কুঁড়ি শুকিয়ে যায়।

ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ

১. বিটপ ও মূলের স্বাভাবিক বিকাশ হয় না।
২. কোষ বিভাজনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।
৩. গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না।
৪. পাতা কম হয়।
৫. উদ্ভিদে আমিষের পরিমাণ কমে যায়।
৬. ফুলের সংখ্যা কমে যায়।
৭. ফল ঝরে যায় ও ফলের আকার ছোট থাকে।

পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

১. উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
২. পোকামাকড়ের আক্রমণ বাড়ে।
৩. সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস পায়।
৪. গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৫. গাছের পাতা তামাটে বর্ণ ধারণ করে।
৬. শিকড়ের বৃদ্ধি ঘটে না।
৭. খরা সহ্য করার ক্ষমতাও কমে যায়।

সালফারের অভাবজনিত লক্ষণ

১. উদ্ভিদ কোষের বিভাজনে বিঘ্ন ঘটে।
২. গাছ খর্বাকৃতির হয়।
৩. পাতা ছোট ও বিবর্ণ হয়।
৪. ফসলের পরিপক্বতা বিলম্বিত হয়।
৫. কাণ্ড শুকিয়ে সরু হয়ে যায়।
৬. তেল জাতীয় শস্যের ফলন কমে যায়।

দস্তার অভাবজনিত লক্ষণ

১. ধানের কচি পাতার গোড়া সাদা হয়ে যায়।
২. ভুট্টা, তুলা ইত্যাদি গাছের পাতার শিরার মধ্যবর্তী স্থানে বিবর্ণতা দেখা দেয়।
৩. পাতার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৪. ধানের পুরাতন পাতা মরচে পড়ার রং ধারণ করে।
৫. লেবু গাছের পাতা কুঁকড়ে যায়।

ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

১. কচি পাতার অগ্রভাগের গঠন অস্বাভাবিক হয়।
২. পাতার সবুজ রং বিবর্ণ হয়।
৩. পাতার কিনারায় এবং মাঝখানে হলদে ও বাদামি রং হয়।
৪. পাতা ছোট থাকে।
৫. গাছ খর্বাকৃতির হয়।

লৌহের অভাবজনিত লক্ষণ

১. প্রথমে কচি পাতার সবুজ রং বিবর্ণ হয়।
২. পাতার দুই শিরার মাঝখানে বিবর্ণ রোগ হয়। পরে এই বিবর্ণতা সমগ্র পাতায় ছড়িয়ে পড়ে।
৩. অভাব খুব বেশি হলে পাতা বাদামি রং ধারণ করে।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ সার পরিচিতি

উপকরণ

১. বিভিন্ন প্রকার সার
২. সার রাখার পাত্র
৩. কাগজ ও কলম
৪. পানি
৫. চুন

কাজের ধাপ

নমুনা -ক

১. নমুনা সার হতে কিছু সার হাতে নাও।
২. সারের রং ও দানার আকার ভালোভাবে দেখ।
৩. সারের গন্ধও শুঁকে দেখ।
৪. যদি সারের রং সাদা, আকার সাগুদানার মতো গোলাকার ও তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ হয় তবে নমুনাটি ইউরিয়া সার।
৫. সারে একটু চুন মেশাও, যদি এমোনিয়ার গন্ধ বের হয় তবে এটা নিশ্চিত ইউরিয়া সার।
৬. কাজের ধাপ ও ফলাফল ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

নমুনা-খ

১. এবার অন্য প্রকার সার হাতে নাও।
২. সারের রং, দানার আকার ভালোভাবে লক্ষ কর।
৩. সারের গন্ধও শুঁকে দেখ।
৪. যদি সার মেটে বর্ণের হয়, আকার ইঁদুরের তোলা মাটির মতো হয় আর গন্ধ ঝাঁঝালো না হয় তবে মনে করবে এই সার টিএসপি।
৫. কাজের ধাপ ও ফলাফল তোমার ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

নমুনা -গ

১. এবার অন্য প্রকার নমুনা সার হাতে নাও।
২. সারের রং, আকার ও আকৃতি ভালোভাবে দেখ।
৩. সারের গন্ধও শুঁকে দেখ।
৪. যদি সার ইটের গুঁড়ার বা লালচে বা সাদাটে রঙের হয় এবং আকার লবণের দানার মতো হয় তবে নমুনাটি এমপি সার।
৫. কাজের ধাপ ও ফলাফল ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উদ্ভিদের গৌণ পুষ্টি উপাদান কোন গুলো?

ক. লৌহ, বোরন, সালফার খ. পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সালফার

গ. লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম ঘ. তামা, দস্তা, ম্যাগনেসিয়াম।

২. ১ বিঘা জমিতে ২৩ কেজি নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হলে কী পরিমাণ ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হবে?

ক. ২৫ কেজি খ. ৫০ কেজি

গ. ৭৫ কেজি ঘ. ১০০ কেজি।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কী করণীয় তা জানতে লক্ষীপুর গ্রামের কৃষক ছগির মিয়া স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার নিকট গেলেন। ঐ কর্মকর্তা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান ধানের জীবন চক্রে বিভিন্নভাবে কাজ করে তা জানিয়ে কিছু ধারণা দিলেন। শেষে তিনি ধানের ভালো ফলনের জন্য উন্নত জাতের বীজ ও সুষম সার ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ মতে ধান চাষাবাদে ছগির মিয়া আশানুরূপ ফলন পেলেন।

৩. কৃষি কর্মকর্তা ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কোন সার প্রয়োগের পরামর্শ দেন?

ক. ইউরিয়া খ. টি এস পি

গ. এম পি ঘ. জিপসাম।

৪. ধানের আশানুরূপ ফলন পেতে বেশি জরুরি-

i. উন্নত জাতের বীজ

ii. সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ

iii. সময়মতো সেচ দেওয়া।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

কৃষি শিক্ষক মেহেদী হাসান তার দশম শ্রেণীর ছাত্রদের উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দেওয়ার জন্য ছাত্রদের গোবিন্দগঞ্জ গ্রামের কৃষি জমি পরিদর্শনে নিয়ে গিয়ে দেখলেন ধানের কচি পাতার গোড়া সাদা হয়ে গেছে এবং পুরোনো পাতা মরচে পড়া রঙের হয়ে আছে। আলুর পাতা হলদে হয়ে আছে এবং সরিষা গাছে অত্যন্ত কম ফুল হয়েছে। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিলেন।

ক. উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কাকে বলে?

খ. ধান গাছের কচি পাতা সাদা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. কীভাবে আলুর পাতা হলদে হওয়া প্রতিরোধ করা যাবে? বর্ণনা কর।

ঘ. সরিষা গাছে ফুল কম হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বীজ

বীজের ধারণা

সাধারণভাবে উদ্ভিদের বংশবিস্তারের জন্য যে জীবন্ত মাধ্যম ব্যবহার করা হয় তাকে বীজ বলে। বীজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি সংজ্ঞা জানা দরকার।

ক. উদ্ভিদ বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসারে

বীজ হচ্ছে নিষিক্ত ও পরিপক্ব ডিম্বক; যেমন- ধান, গম, সরিষা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি। কেবলমাত্র সপুষ্পক উদ্ভিদই এরূপ বীজ উৎপন্ন করতে পারে।

খ. কৃষি তত্ত্ব অনুসারে

উদ্ভিদের যে কোনো অংশ যা উপযুক্ত পরিবেশে আপন জাতের নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে তাকে বীজ বলে। এক্ষেত্রে উদ্ভিদের শাখা, মূল, পাতা, কুঁড়ি ইত্যাদি বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আখের টুকরা, গোল আলু, মিষ্টি আলু, কাকরোলের মূল, আমের কলম ও কচু এই প্রকার বীজের উদাহরণ।

বীজের গুণাবলি

বীজের অনেক রকমের গুণ রয়েছে। পরীক্ষা করে এসব গুণাবলি নির্ণয় করা হয়। নিম্নে কয়েকটি গুণ নিয়ে আলোচনা করা হল।

১. বীজ বিশুদ্ধতা

বীজ বিশুদ্ধতা বলতে কোন বীজ নমুনার মধ্যে কী পরিমাণ বিশুদ্ধ বীজ রয়েছে তাকে বোঝায়। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজ প্রক্রিয়াকরণ করলে বীজের সজীবতা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত টিকে থাকে। বীজের মধ্যে অন্য ফসলের বীজ, আগাছার বীজ ও কাঁকর জাতীয় দ্রব্য থাকলে বীজের গুণ নষ্ট হয়। বীজ উৎপাদনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে বীজে অন্য ফসলের বীজ, ময়লা বা আগাছার বীজের মিশ্রণ না ঘটে।

২. জাত বিশুদ্ধতা

কোনো বীজের নমুনার মধ্যে একই ফসলের অন্য জাতের বীজ থাকলে বীজের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করলে জাত বিশুদ্ধতা বজায় থাকে।

৩. বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা

কোনো বীজ নমুনার শতকরা কয়টি বীজের অঙ্কুরোদগম হবে সেই হিসাব দ্বারা বীজের ভালোমন্দ গুণ বিচার করা হয়। নমুনা বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা যদি শতকরা ৭০-৮০ ভাগ হয় তবে সেই বীজ ভালো বলে বিবেচিত হয়।

৪. বীজের তেজ

নমুনা বীজের চারা যদি সতেজ, সজীব ও স্বাস্থ্যবান হয় এবং প্রতিকূল অবস্থায় তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে পারে তবে সেই বীজকে তেজস্বী বীজ বলা হয়।

৫. বীজের আকার ও আকৃতি

ভালো বীজ পরিপক্ব, পুষ্ট ও স্বাভাবিক আকারের হবে।

৬. বীজের আর্দ্রতা

নমুনা বীজের মধ্যে শতকরা কত ভাগ পানি আছে তাই বীজের আর্দ্রতা।

৭. বীজের সুস্থতা

বীজ সর্বদাই নীরোগ ও কীটমুক্ত হবে।

বীজের শ্রেণী

বাংলাদেশ বীজ বিধি ১৯৮০ অনুসারে বীজকে ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে; যথা-

১. মৌল বীজ
২. ভিত্তি বীজ
৩. প্রত্যায়িত বীজ।

১. মৌল বীজ

উদ্ভিদ প্রজনন বিজ্ঞানীদের ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে সকল বংশগত গুণাগুণ রক্ষা করে যে বীজ উৎপাদন করা হয় তাকে মৌল বীজ বলে। মৌল বীজ হচ্ছে অনুমোদিত বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ।

২. ভিত্তি বীজ

মৌল বীজ হতে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা হয়। বীজ অনুমোদনকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজ উৎপাদনের বিধি মেনে জাতের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে যে বীজ উৎপাদন করা হয় তাকে ভিত্তি বীজ বলে।

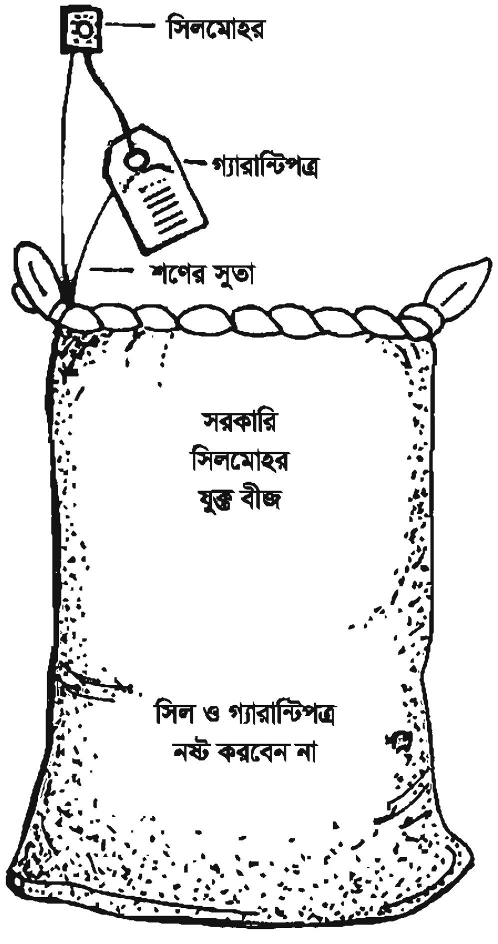

ট্যাগ সম্বলিত বীজ ব্যাগ

৩. প্রত্যায়িত বীজ

ভিত্তি বীজ হতে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করা হয়। বীজ অনুমোদন সংস্থার তালিকাভুক্ত চাষি বীজ উৎপাদনের বিধি মেনে যে বীজ উৎপাদন করে তাকে প্রত্যায়িত বীজ বলে। বীজ অনুমোদন সংস্থা এই বীজকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদন প্রদান করে। অতঃপর চাষিদের ব্যবহারের জন্য এই বীজ সরবরাহ করা হয়।

বীজ উৎপাদন কৌশল

বীজ উৎপাদন একটি জটিল প্রক্রিয়া। উন্নত মানের বীজ পেতে হলে যথাযথ নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বীজ উৎপাদন করতে হবে। ফসল উৎপাদনের জন্য যেসব ধাপ অতিক্রম করা হয় বীজ উৎপাদনের জন্যও সেভাবেই অগ্রসর হতে হবে। পার্থক্য হল এই যে, বীজ অনুমোদন সংস্থা কর্তৃক তালিকাভুক্ত কৃষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজ উৎপাদন করা হয়।

বীজ উৎপাদনের ধাপ

বীজ উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়।

১. বীজ জমি নির্বাচন
২. বীজ জমি পৃথকীকরণ
৩. বীজ সংগ্রহ
৪. বীজের হার নির্ধারণ
৫. নির্বাচিত জমি প্রস্তুতকরণ
৬. বীজ বপন
৭. রোগিং বা বাছাইকরণ
৮. পরিচর্যা।

১. বীজ জমি নির্বাচন

বীজ উৎপাদনের জন্য উর্বর জমি নির্বাচন করা উচিত। জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত ও আলোবাতাসযুক্ত হতে হবে। নির্বাচিত জমিতে পূর্ববর্তী বছরে একই জাতের বীজের চাষ না হয়ে থাকলে আরোও ভালো। নির্বাচিত জমিতে অন্তত ২% জৈব পদার্থ থাকা উচিত।

২. বীজ জমি পৃথকীকরণ

বীজের উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত জমি ও পার্শ্ববর্তী একই ফসলের জমির মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধান থাকতে হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত শস্য বীজের সাথে যেন অন্য জাতের বীজের সংমিশ্রণ না ঘটে।

৩. বীজ সংগ্রহ

বীজ সংগ্রহ বীজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বীজ উৎপাদনের জন্য অবশ্যই প্রত্যায়িত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজ সংগ্রহের সময় নিম্নোক্ত তথ্য জেনে নিতে হবে।

ক. জাতের নাম
খ. বীজ উৎপাদনকারীর নাম ও নম্বর
গ. অন্য জাতের বীজের শতকরা হার
ঘ. বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা
ঙ. বীজের আর্দ্রতা
চ. বীজ পরীক্ষার তারিখ।

উল্লিখিত তথ্যগুলো একটি গ্যারান্টি পত্রে ট্যাগ লিখে বীজের বস্তায় বা প্যাকেটে রাখা হয়।

৪. বীজের হার নির্ধারণ

বীজের বিশুদ্ধতা, সজীবতা, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, আকার, বপনের সময়, মাটির উর্বরতা শক্তি এসব বিবেচনা করে হেক্টর প্রতি বীজের হার নির্ধারণ করা হয়।

৫. নির্বাচিত জমি প্রস্তুতকরণ

এক এক জাতের বীজের জন্য জমির প্রস্তুতি এক এক রকম হয়ে থাকে। যেমন, রোপা ধানের বীজ উৎপাদন করতে জমি ভালোভাবে কর্দমাক্ত করে চাষ করতে হবে। আবার গমের বেলায় জমি শুকনো অবস্থায় ৪-৫ বার চাষ করে পরিপাটি করতে হবে। সার প্রয়োগের মাত্রাও এক এক বীজের জন্য এক এক রকম হবে।

৬. বীজ বপন

নির্বাচিত ফসলের বীজ উপযুক্ত সারিতে বপন করতে হবে। বীজতলায় প্রতিটি বীজ সমান গভীরতায় বপন করা উচিত। কোন বীজ কত গভীরতায় বপন করতে হবে তা বীজের আকার, আর্দ্রতা ও মাটির বুনটের ওপর নির্ভর করে।

৭. রোগিং বা বাছাইকরণ

বীজ বপনের সময় যতই বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার করা হোক না কেন জমিতে কিছু কিছু অন্য জাতের উদ্ভিদ ও আগাছা দেখা যাবে। তাই প্রায়ই জমিতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ তুলে ফেলতে হবে। তিন পর্যায়ে রোগিং বা বাছাই করা হয়।

ক. ফুল আসার আগে
খ. ফুল আসার সময়
গ. পরিপক্ব পর্যায়ে।

৮. পরিচর্যা

বীজের উৎপাদনের জন্য খুব বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। নিচে পরিচর্যার একটি তালিকা দেওয়া হল।

ক. সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা
খ. জৈব সার প্রয়োগ
গ. প্রয়োজন মতো সেচ দেওয়া
ঘ. বৃষ্টির পানি বা সেচের পানি জমলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা
ঙ. আগাছা পরিষ্কার করা
চ. রোগ ও পোকা দমন করা
ছ. সারের উপরি প্রয়োগ করা।

৯. বীজ সংগ্রহ

বীজ পাকার রং ধারণ করার পর পরই কাটতে হবে। তারপর মাড়াই করে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে।

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ

ফসলের সাথে আগাছা বা অন্য শস্যের বীজ মিশে থাকতে পারে। বীজ মাড়াই ও ঝাড়ার পর খুব ভালোভাবে বীজ বাছাই করতে হবে। যাতে অন্য বীজ না থাকে। বাছাই করা বীজ রোদে কয়েকদিন ভালোভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ

বীজের আর্দ্রতা যত বেশি হবে বীজের সজীবতা ততই হ্রাস পাবে। ধান, গম ইত্যাদি দানা জাতীয় বীজের আর্দ্রতা শতকরা ৮-১০ ভাগ হলে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। বীজের আর্দ্রতা এর বেশি হলে বীজ রোগাক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়। আবার আর্দ্রতা এর কম হলেও সজীবতা নষ্ট হয়।

বীজ সংরক্ষণের সাধারণ নীতি

১. বীজ রাখার গুদাম ঘর শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে হতে হবে।
২. বীজ উত্তমরূপে রোদে শুকিয়ে ছায়ায় ঠান্ডা করতে হবে।
৩. গুদাম ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. যে কোনো ধরনের পাত্রে বা পলিথিন মোড়কে বায়ু রুদ্ধ অবস্থায় বীজ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
৫. বীজ গুদাম ঘর হতে বের করে মাঝে মাঝে রোদে শুকাতে হবে।
৬. গুদাম ঘরে যাতে কীটপতঙ্গের আক্রমণ না হয় সেজন্য রাসায়নিক ধোঁয়া প্রয়োগ করতে হবে।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ বীজের বিশুদ্ধতার হার নির্ণয়

উপকরণ

বীজ ও নিক্তি।

কাজের ধাপ

১. যে কোনো ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ মেপে নাও।
২. বীজগুলো সাদা কাগজের উপর বিছাও।
৩. বীজগুলো হতে বিশুদ্ধ বীজ বাছাই কর ও মেপে নাও। ধর এর ওজন 'ক' গ্রাম।
৪. অন্য জাতের বীজও বাছাই কর ও মেপে নাও। ধর এর ওজন 'খ' গ্রাম।
৫. পাথর ও কাঁকর জাতীয় জড় পদার্থ বাছাই কর ও মেপে নাও। ধর এর ওজন 'গ' গ্রাম।

৬. এবার নিচের সূত্র ব্যবহার করে বীজের বিশুদ্ধতার হার নির্ণয় কর।

$$\text{বীজের বিশুদ্ধতার হার} = \frac{\text{ক} \times ১০০}{\text{ক} + \text{খ} + \text{গ}} \qquad \text{অন্য বীজের হার} = \frac{\text{খ} \times ১০০}{\text{ক} + \text{খ} + \text{গ}}$$

$$\text{জড় পদার্থের হার} = \frac{\text{গ} \times ১০০}{\text{ক} + \text{খ} + \text{গ}}$$

৭. উল্লিখিত কাজের ধাপগুলো অনুসরণ করে বিভিন্ন বীজের হার নির্ণয় কর ও ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

বিষয় ঃ ধানের বীজ বাছাই

উপকরণ

১. ১ কেজি ধানের বীজ
২. ১৩ লিটার পানি
৩. ১টি বালতি
৪. আধা কেজি ইউরিয়া।

কাজের ধাপ

১. ২০ লিটার পানি ধরে এরূপ একটি বালতি নাও।
২. বালতিতে ১৩ লিটার পরিষ্কার পানি নাও।
৩. আধা কেজি ইউরিয়া সার বালতির পানিতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি কর।
৪. এবার ধানের বীজ উক্ত দ্রবণে ছেড়ে দাও। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া কর।
৫. বালতির বীজ ভালোভাবে লক্ষ কর।
৬. ভারী, পুষ্ট ও সবল বীজগুলো বালতির তলায় জমা হয়েছে কিনা দেখ।
৭. অপুষ্ট বীজগুলো বালতির পানিতে ভাসছে কিনা দেখ।
৮. হাত বা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো তুলে ফেল।

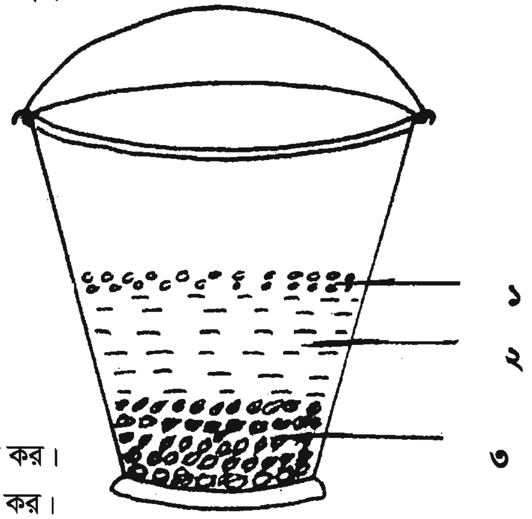

১. চিটা ধান
২. ইউরিয়া ও পানির দ্রবণ
৩. পুষ্ট দানা বীজ

ইউরিয়া পদ্ধতিতে ধান বীজ বাছাই

৯. এবার বালতির তলায় পড়ে থাকা বীজগুলো তুলে পরিষ্কার পানিতে ২-৩ বার ভালোভাবে ধুয়ে ছায়ায় শুকাও।
১০. উল্লিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করে ধানের বীজ বাছাই কর ও ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি কৃষিতাত্ত্বিক বীজ?

ক. খ. 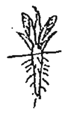

গ. ঘ.

২. বীজ সংরক্ষণের সাধারণ নীতি হল-

i. গুদামঘর শুষ্ক ও ঠান্ডা হতে হবে

ii. গুদামঘর বায়ুরুদ্ধ রাখতে হবে

iii. বীজ উত্তমরূপে রোদে শুকিয়ে ছায়ায় ঠান্ডা করাতে হবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

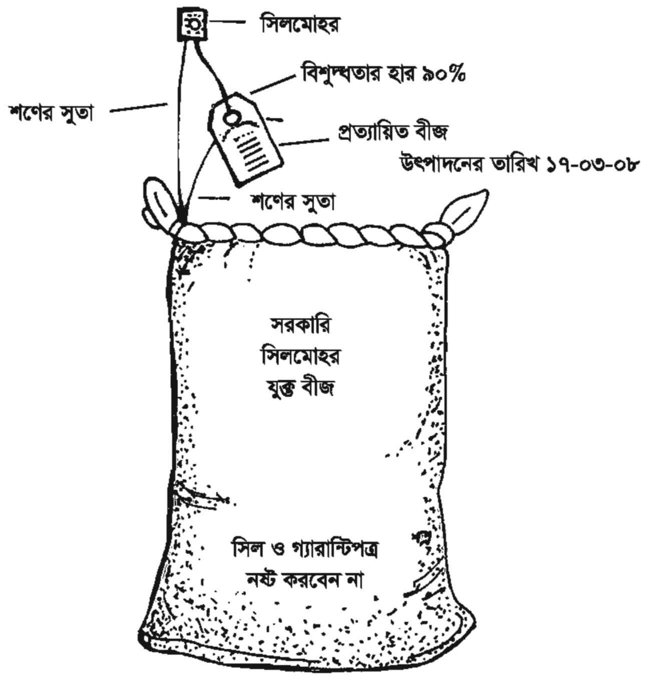

ক. গ্যারান্টি পত্রে উল্লিখিত প্রত্যায়িত বীজ কী?

খ. বীজ বস্তার সিল ও গ্যারান্টিপত্র নষ্ট না করার জন্য বলার গুরুত্বপূর্ণ ১টি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. গ্যারান্টিপত্রে উল্লিখিত বিশুদ্ধতার হার নির্ণয়ের পরীক্ষাটি বর্ণনা কর।

ঘ. বীজ উৎপাদন পদ্ধতির এবং সাধারণ ফসল উৎপাদন পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষি যন্ত্রপাতি ও সেচ

কৃষি যন্ত্রপাতি

কৃষিকাজ করার জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে কৃষি যন্ত্রপাতি বলে। কৃষির বিভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। কৃষি যন্ত্রপাতিগুলোকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায় -

১. হস্তচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি

২. শক্তিচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি।

১. হস্তচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি

নিচে বাংলাদেশে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয় এমন কতকগুলো হস্তচালিত যন্ত্রপাতির বর্ণনা দেওয়া হল।

লাঙল

লাঙল বাংলাদেশের কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে অন্যতম। একটি বাঁকানো কাঠের অগ্রভাগে লোহার ফলাযুক্ত করে লাঙল তৈরি করা হয়। জমি চাষ ও অগভীর নালা তৈরির জন্য লাঙল ব্যবহার করা হয়। লাঙলের প্রধান অংশ হচ্ছে-

১. বাঁকানো কাঠ বা শরীর (বডি)

২. লোহার ফাল

৩. ঈশ ও খিল

৪. হাতল ও বাঁট।

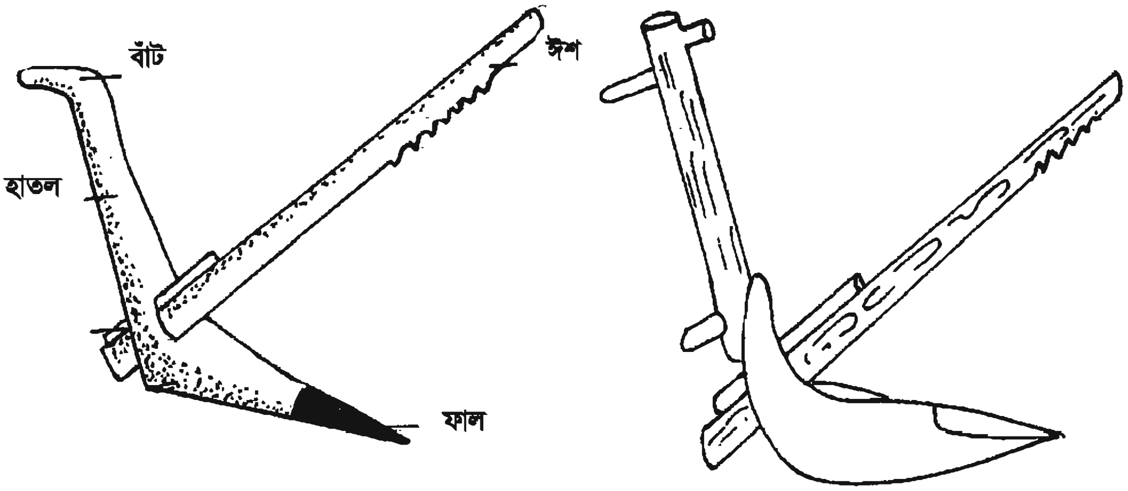

লাঙল

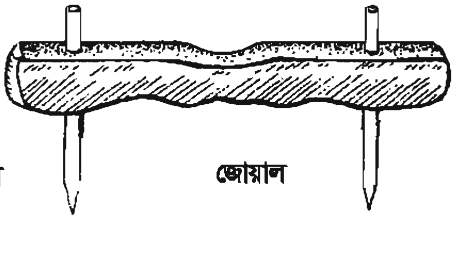
জোয়াল

জোয়াল

জোয়াল লাঙলের অংশ না হলেও অংশ বলে ধরা হয়। জোয়াল গরুর কাঁধে রেখে একটি রশির সাহায্যে লাঙলের সাথে জোড়া হয়। জোয়াল কাঠ অথবা বাঁশ দ্বারা তৈরি করা হয়।

কোদাল

জমির কোনা ও আইল বরাবর উত্তমরূপে চাষ করার জন্য কোদাল ব্যবহার করা হয়। কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে শাকসবজির বাগান করা হয়। ফলের বাগানে বা সারি করে লাগানো ফসলের জমিতে কোদাল ব্যবহার বেশ সুবিধাজনক। কোদালের অংশ ২টি;

১. ব্লেড বা ফলক- লোহার পাত

২. হাতল।

কোদাল

আঁচড়া বা বিঁদা

আঁচড়া বাঁশ ও কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়। আগাছা দমন, চারা পাতলাকরণ ও মাটি আলগা করার জন্য ফসলের জমিতে আঁচড়া ব্যবহার করা হয়।

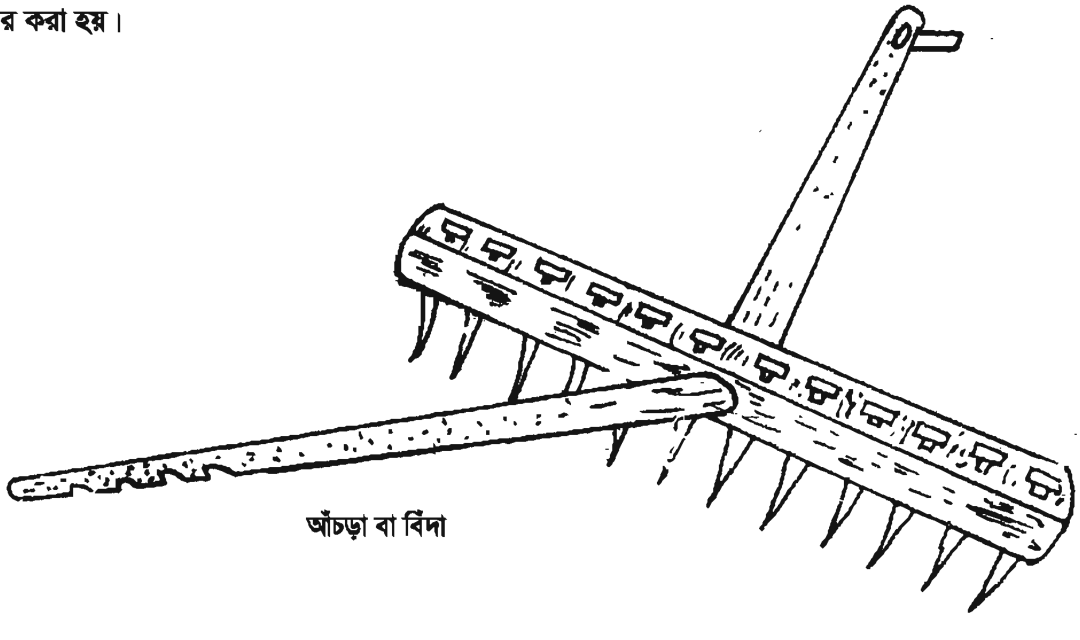

আঁচড়া বা বিঁদা

নিড়ানি

নিড়ানিও কৃষিকাজে খুব বেশি ব্যবহার করা হয়। আগাছা পরিস্কার ও গাছের গোড়ার মাটি আলগা করার জন্য নিড়ানির প্রয়োজন

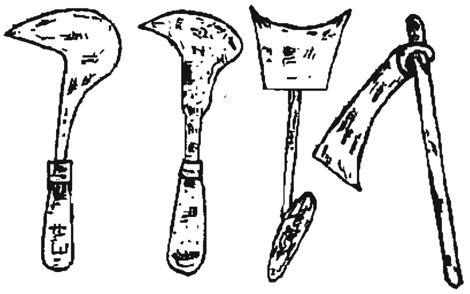

নিড়ানি

কাঁচি

কাঁচি ফসল কাটার যন্ত্র।

কাঁচি

মই

মই বাঁশ বা কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়। তবে বাঁশ দ্বারা তৈরি মই বেশি প্রচলিত। মই প্রধানত ৪টি কাজ করে-

১. মাটির ঢেলা চূর্ণ করে
২. আগাছা দলন করে
৩. মাটি সমতল করে
৪. মাটিতে দৃঢ়তা আনে।

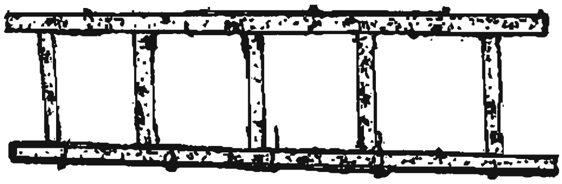

মই

দা

দা লোহার তৈরী কৃষির আনুষঙ্গিক কাজ করার একটি যন্ত্র। নিচের দিকে সরু করে একটি কাঠের বাঁট লাগানো হয়। কাঁচির চেয়ে দা ভারী ও পুরু।

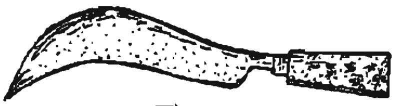

দা

মুগুর

মাটির বড় বড় ঢেলা ভাঙার জন্য মুগুর ব্যবহার করা হয়। মুগুরের দুটি অংশ; -
১. মূল অংশ
২. হাতল।

মুগুর

কলম ছুরি

কলম ছুরি গাছের কলম তৈরি করার জন্য বিশেষভাবে তৈরী এক রকম ছুরি। সাধারণত এই ছুরি নার্সারিতে ব্যবহার করা হয়।

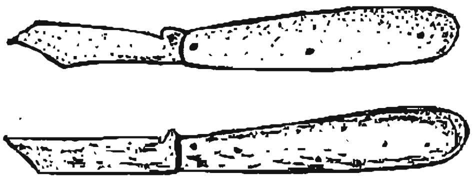

কলম ছুরি

মোল্ডবোর্ড লাঙল

মোল্ডবোর্ড লাঙল দেশি লাঙলের চেয়ে উন্নত। মাটি গভীরভাবে চাষ করার জন্য এই লাঙল ব্যবহার করা হয়। এই লাঙলের কার্যক্ষমতা বেশি।

উন্নত নিড়ানি যন্ত্র

এই যন্ত্র লোহার তৈরী। ধান, পাট, গম ইত্যাদি ফসলের সারির মধ্যে আগাছা পরিষ্কার করার জন্য এই নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

প্যাডেল থ্রেসার

এটি একটি গিয়ার সংযোগশক্তি সম্পন্ন মাড়াই যন্ত্র। এতে একটি টাইনযুক্ত ড্রাম থাকে। প্যাডেলের সাহায্যে ড্রামের ঘূর্ণন ঘটিয়ে এর উপর ফসলের শীষ রেখে টাইনের আঘাতে শস্য দানা বিচ্ছিন্ন করা হয় অর্থাৎ মাড়াই হয়। এই যন্ত্রটি দামে সস্তা। আমাদের দেশের সাধারণ কৃষকেরাও ব্যবহার করতে পারে।

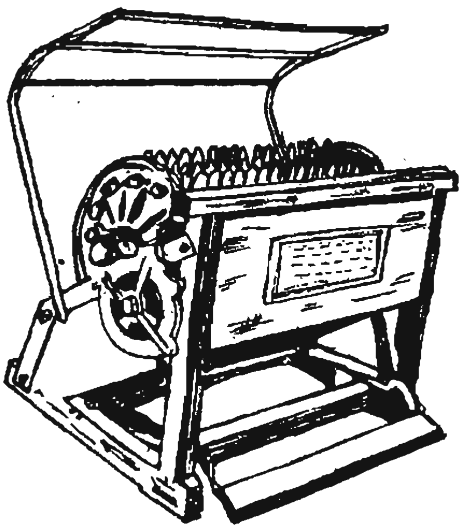

প্যাডেল থ্রেসার

ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার

প্যাডেল থ্রেসার ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার

এটি একটি বিশেষ ধরনের ওষুধ ছিটানোর যন্ত্র। এর দ্বারা কাঙ্ক্ষিত উচ্চতায় ট্রিগারযুক্ত লম্বা ল্যান্সের মাধ্যমে পানি মিশ্রিত তরল বালাইনাশক ছিটানো হয়। যন্ত্র কাঁধে বহন করা যায়। এই স্প্রেয়ার দ্বারা ফসলের মাঠে অথবা ফলের গাছে কীটনাশক ছিটিয়ে পোকামাকড় দমন করা যায়।

শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি

কৃষিকাজের জন্য শক্তিচালিত যন্ত্রপাতির মধ্যে পাওয়ার টিলার, ট্রাকটর, হ্যারো, পাওয়ার পাম্প, অগভীর নলকূপ, গভীর নলকূপ, মাড়াই যন্ত্র ও স্প্রেয়ার ইত্যাদিই প্রধান।

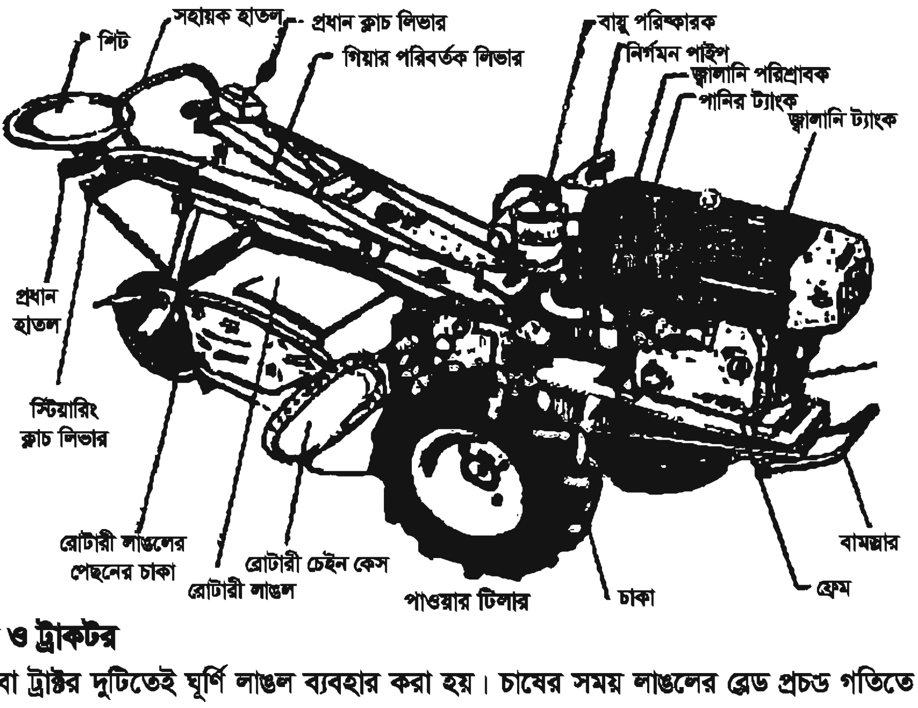

পাওয়ার টিলার

পাওয়ার টিলার ও ট্রাকটর

পাওয়ার টিলার বা ট্রাক্টর দুটিতেই ঘূর্ণি লাঙল ব্যবহার করা হয়। চাষের সময় লাঙলের ব্লেড প্রচন্ড গতিতে মাটি কর্ষণ করে। এতে মাটি ঝুরঝুরে হয় ও আগাছা ধ্বংস হয়। ঘূর্ণি লাঙল ছাড়াও পাওয়ার টিলারের ফালি লাঙল ব্যবহার করা

যায়। পাওয়ার টিলারের ফালি লাঙলে জমিতে গভীরভাবে চাষ দেওয়া যায়। প্রধানত প্রাথমিক চাষের সময় জমিতে ঘূর্ণি লাঙল চালাতে না পারলে ফালি লাঙল দিয়ে চাষ দেওয়া হয়।

পানি সেচ

ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে জমিতে পানি সরবরাহকে সেচ বলে। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় সেচ অত্যাবশ্যক। সেচ ব্যতীত উন্নত কৃষিকাজের কথা ভাবা যায় না। উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য মাটিতে পরিমিত পানি থাকা দরকার। পানির অভাব হলেই ফসলের জমিতে পানি সেচের প্রয়োজন দেখা দেয়।

সেচের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু এই বৃষ্টিপাত সব সময় কৃষিকাজে লাগে না। তাই বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে ফসল চাষাবাদ করলে সব সময় ভালো ফলন পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে বর্ষাকালে বৃষ্টি হলেও শীত মৌসুমে বৃষ্টি হয় না। আর দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষাকালেও বৃষ্টিপাত কম হয়। ফলে পানির অভাবে ফসলের ফলন কম হয়। এরূপ অবস্থায় ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচ দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পানি সেচের উদ্দেশ্য

পানি সেচের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ।

১. মাটিতে অবস্থিত উদ্ভিদের বিভিন্ন খাদ্য উপাদান দ্রবীভূত রাখা।
২. মাটির জৈব পদার্থের পচনক্রিয়ায় সাহায্য করা।
৩. জমির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করা।
৪. মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।
৫. শস্যের ফলন বৃদ্ধি করা।

সেচ পদ্ধতি

বিভিন্ন পদ্ধতিতে জমিতে পানি সেচ দেওয়া যায়। কতকগুলো বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সেচ পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়। বিষয়গুলো হল-

১. মাটির প্রকার ও ভূমির ঢাল
২. পানির উৎস
৩. ফসল প্রকৃতি
৪. আর্থিক সংগতি।

পানি সেচ পদ্ধতিকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা হয়-

১. ভূপৃষ্ঠ সেচ পদ্ধতি
২. ভূনিম্নস্থ সেচ পদ্ধতি
৩. ফোয়ারা সেচ পদ্ধতি
৪. ড্রিপ সেচ পদ্ধতি।

ভূপৃষ্ঠ সেচ পদ্ধতি

পৃথিবীর সব দেশেই এই পদ্ধতিতে সেচের প্রচলন রয়েছে। আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফসলের জমিতে ভূপৃষ্ঠ সেচ পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়।

ভূপৃষ্ঠ সেচ পদ্ধতি ৬ প্রকার-

১. প্লাবন সেচ পদ্ধতি
২. নালা সেচ পদ্ধতি
৩. আইল সেচ পদ্ধতি
৪. বাঁধ এবং নালা সেচ পদ্ধতি
৫. করুগেশন সেচ পদ্ধতি
৬. বৃত্তাকার সেচ পদ্ধতি।

১. প্লাবন সেচ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে প্রধান নালার সাহায্যে জমির উপরের অংশে পানি এনে জমির সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পানি জমিতে ধরে রাখার জন্য জমির চারদিকে আইল বেঁধে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে অল্প শ্রমে বেশি এলাকায় সেচ দেওয়া সম্ভব।

২. নালা সেচ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে পানি প্রধান নালা হতে শাখা নালায় সরবরাহ করা হয়। সারিতে লাগানো ফসলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। নালা সেচ পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল একই পরিমাণ পানি দ্বারা বেশি পরিমাণ জমিতে সেচ দেওয়া যায়।

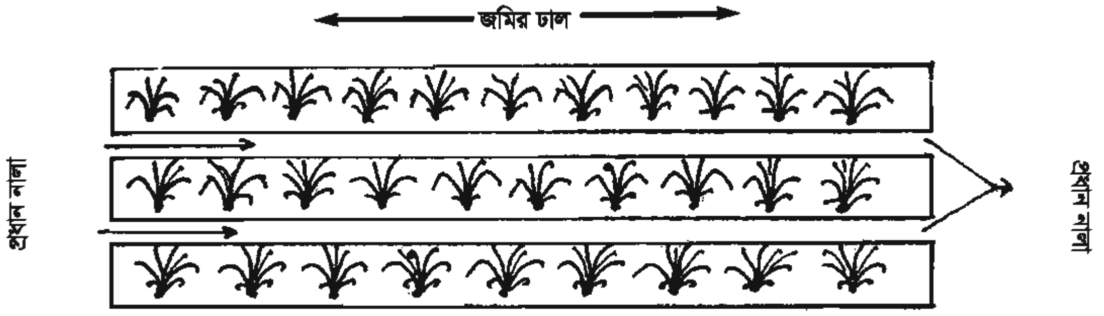

নালা সেচ

৩. আইল সেচ পদ্ধতি : আইল পদ্ধতিতে আইল দ্বারা জমিকে সুবিধামতো ছোট ছোট খন্ডে ভাগ করা হয় এবং তাতে প্লাবন আকারে সেচ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে পানি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

৪. বাঁধ এবং নালা সেচ পদ্ধতি : ঢালু জমিতে এই সেচ পদ্ধতিতে পানি সেচ দেওয়া হয়। প্রথমে জমির ঢালে আড়াআড়ি কতগুলো নালা কাটা হয়। পানির উৎস থেকে উঁচু নালায় পানি ছাড়া হয়। জমির সর্বত্র পানি ছড়ানোর জন্য প্রত্যেক নালার শেষ প্রান্ত কেটে দিতে হয়। বাঁধ ও নালা সেচ পদ্ধতিতে সহজে পানি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৫. করুগেশন সেচ পদ্ধতি : করুগেশন পদ্ধতিতে জমিতে ছোট ছোট নালা কাটা হয়। নালাগুলো এমন দূরত্বে কাটা হয় যাতে দুই নালার মধ্যবর্তী জমি নালার পানি দ্বারা সিক্ত হতে পারে। এঁটেল মাটির জন্য এই পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া সুবিধাজনক।

৬. বৃত্তাকার সেচ পদ্ধতি : সাধারণত বহুবর্ষজীবী গাছের ক্ষেত্রে এই সেচ প্রযোজ্য। এই পদ্ধতিতে প্রথমে গাছের সারির মধ্য দিয়ে প্রধান নালা কাটতে হয়। তারপর প্রতিটি গাছের গোড়ার চারদিকে বৃত্তাকার নালা কাটতে হয়। এরপর ছোট ছোট নালা কেটে প্রধান নালার সাথে বৃত্তাকার নালা যোগ করতে হয়। ফলের বাগানে এ ধরনের সেচ দেওয়া হয়।

ভূনিম্নস্থ সেচ পদ্ধতি : ভূনিম্নস্থ সেচ পদ্ধতি একটি বিশেষ ধরনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে এক প্রকার নল দ্বারা গাছের শিকড় ও মূল অঞ্চলে সেচ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল, এতে মাটির উপর চটা বাঁধে না।

ফোয়ারা সেচ পদ্ধতি : যে পদ্ধতিতে বৃষ্টির আকারে জমিতে পানি সেচ দেওয়া হয় তাকে ফোয়ারা সেচ পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে পাম্পের সাহায্যে নলের ভেতরে পানি সরবরাহ করে নলের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চতুর্দিকে পানি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অসমতল এবং ঢালু জমিতে এই সেচ পদ্ধতি বেশ উপযোগী।

ড্রিপ সেচ পদ্ধতি : যে পদ্ধতিতে ফোঁটায় ফোঁটায় গাছের গোড়ায় পানি প্রয়োগ করা হয় তাকে ড্রিপ সেচ পদ্ধতি বলে। ফোঁটা ফোঁটা করে সব সময় গাছের গোড়ায় পানি দেওয়া হয় বলে এটাকে নিত্য সেচও বলে। এই পদ্ধতিতে সেচ দিলে মাটিতে রসের অভাব হয় না।

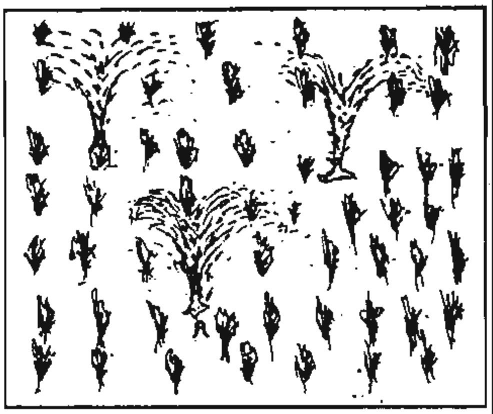

ফোয়ারা সেচ

ফসলের জমিতে সেচ দেওয়ার সময় : জমিতে আর্দ্রতার পরিমাণ নির্ণয় করে সেচ দেওয়া দরকার। কারণ রস থাকা অবস্থায় সেচ দিলে পানির অপচয় এবং জলাবদ্ধতা সৃষ্টি এই দুই ধরনের ক্ষতি হবে। আবার জমি বেশি শুকিয়ে সেচ দিলেও ফসলের তেমন কাজে আসবে না। তাই ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের জন্য যথাসময়ে সেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ১০ সেমি হতে ১৫ সেমি নিচ পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে মাটি সংগ্রহ করে হাতে চাপ দিলে যদি দলা বাঁধে তবে বোঝা যাবে মাটিতে রস আছে। আর যদি মাটি গুঁড়া হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে এখন ফসলে সেচ দেওয়ার সময় হয়েছে।

বাংলাদেশের সেচ প্রকল্প : দেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন সেচ প্রকল্প আছে। নিচে প্রধান প্রধান সেচ প্রকল্পের নাম এবং আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ উল্লেখ করা হল।

এসব সেচ প্রকল্প এলাকায় সেচ দিয়ে প্রচুর বোরো, আউশ ও আমন ধান, পাট, গম, আলু, শাকসবজি, ফলমূল ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করা হয়।

সেচ প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকা (হেক্টর)
১। গঙ্গা- কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প (জি.কে. প্রজেক্ট)	১,৪০,০০০
২। বরিশাল সেচ প্রকল্প (বি.আই.পি)	১,০৬,০০০
৩। ভোলা সেচ প্রকল্প	৫২,০০০
৪। ঠাকুরগাঁও গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্প	৪৬,০০০
৫। চাঁদপুর সেচ প্রকল্প (সি.আই.পি)	২৯,০০০
৬। মুহুরী সেচ প্রকল্প (এম.আই.পি)	২৭,০০০
৭। পাবনা আইআরডি	২৫,০০০
৮। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	১৭,০০০
৯। কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (কে.আই.পি)	১৮,০০০

পানি সেচের যন্ত্রপাতি

বাংলাদেশে ফসলের জমিতে সেচের জন্য নানা প্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। নিচে কয়েকটি যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১. সেঁউতি : বাঁশ, বেত বা টিন দ্বারা তিন কোনা করে তৈরি করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই সেচের জন্য সেঁউতি এদেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

২. দোন : সরু নৌকার মতো করে তাল গাছের গুঁড়ি কিংবা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। এটিও প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

৩. ট্রেডেল পাম্প : ট্রেডেল পাম্প প্লাস্টিক ঢাকনাযুক্ত ধাতব এক বা দুই সিলিন্ডার বিশিষ্ট হস্তচালিত পাম্প। মাটির নিচে চালনিযুক্ত একটি বাঁশ পোঁতা হয়। অতঃপর পাম্পটি বাঁশের নলের মুখে সংযোগ করা হয়। এরপর লিভারের মতো দুটি বাঁশ লাগানো হয়। ঢেঁকির মতো করে পায়ের দ্বারা লিভার যন্ত্র চালিয়ে পানি উত্তোলন করা হয়। এটি একটি জনপ্রিয় পাম্প।

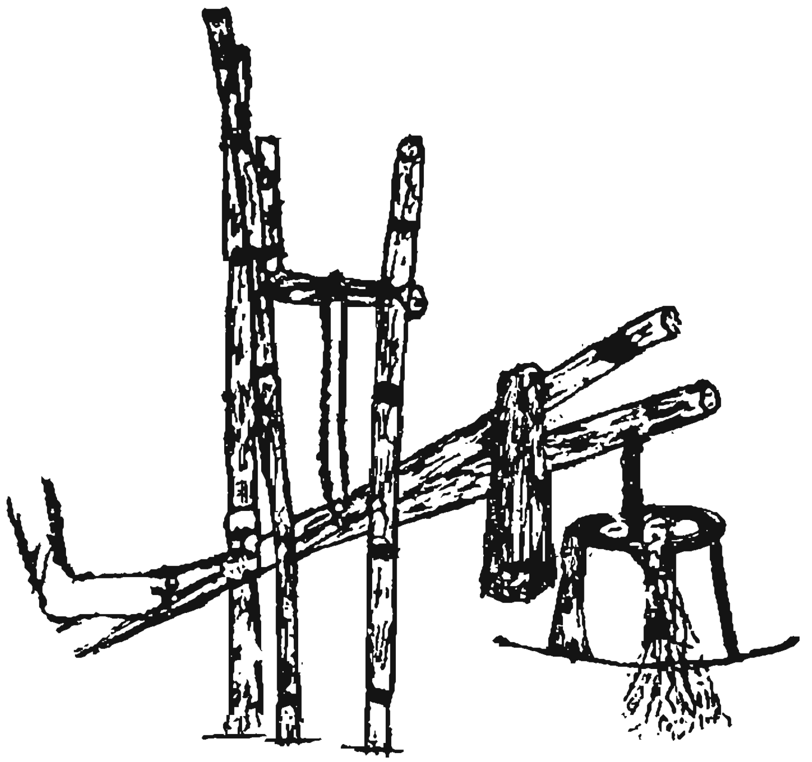

ট্রেডেল পাম্প

সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প

৪. সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প : এটি একটি বহুল ব্যবহৃত শক্তিচালিত সেচযন্ত্র। লোলিফট পাম্প, অগভীর নলকূপ ও গভীর নলকূপে সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ব্যবহার করে নদী ও ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে সেচ দেওয়া হয়।

পানি নিকাশ

ফসলের জমি হতে কৃত্রিম উপায়ে অতিরিক্ত পানি সরানোর পদ্ধতিকে পানি নিকাশ বলে। অতিরিক্ত পানি গাছের জন্য খুবই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই যেসব জমিতে বৃষ্টির পানি বা সেচের পানি জমা হয়ে থাকে সেগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকাশ করা প্রয়োজন।

পানি নিকাশের গুরুত্ব

সমতল হলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিই উঁচুনিচু। অতিবৃষ্টির কারণে বর্ষাকালে এসব জমিতে পানি জমে। এর ফলে সময়মতো চাষাবাদ করা যায় না। অধিকন্তু, প্রতিবছর বন্যায় বিরাট এলাকা জলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এসব জমিতে ঠিক সময়ে চাষাবাদ করতে হলে জমে থাকা পানি সরানো উচিত। নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জমিতে পানি বেশি জমে থাকে।

১. ভারি কাদা মাটির জমি
২. উঁচু নিচু জমি
৩. কঠিন স্তরবিশিষ্ট মাটির জমি।

ফসল উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জমি থেকে যথাসময়ে পানি নিকাশ করা দরকার।

অতিরিক্ত পানির ক্ষতিকর প্রভাব

১. গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত করে।
২. রোগ বালাইয়ের বিস্তার ঘটায়
৩. গাছের মূল ঠিকমতো বিস্তার লাভ করতে পারে না।
৪. উপকারী জীবাণু বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।
৫. গাছের খাদ্য উপাদান বিনষ্ট হয়।
৬. মাটির তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

পানি নিকাশ পদ্ধতি

দুই পদ্ধতিতে পানি নিকাশ করা হয়ে থাকে। ১। খোলা নালা পদ্ধতি ২। বদ্ধ নালা পদ্ধতি।

খোলা নালা পদ্ধতি

আমাদের দেশে সাধারণত খোলা নালা পদ্ধতিতে আবাদি জমিতে পানি নিকাশ করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে জমির সুবিধামতো স্থানে নালা কাটা হয়। পানি তাড়াতাড়ি অপসারণের জন্য নালা ঢালু করে কাটা দরকার। প্রয়োজনমতো প্রধান নালার সাথে ছোট ছোট নালাও যুক্ত করা হয়।

বদ্ধ নালা পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে নালা কেটে মাটির ভেতরে আবদ্ধ করে সেই নালা দ্বারা পানি অপসারণ করা হয় তাকে বদ্ধ নালা পদ্ধতি বলে। বদ্ধ নালা পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হচ্ছে এতে কোনো জমি নষ্ট হয় না। এই পদ্ধতি আবার তিন প্রকার-

১. নল পদ্ধতি
২. বাক্স নালা পদ্ধতি
৩. পাথর নালা পদ্ধতি।

১. নল পদ্ধতি

প্লাস্টিক নল বিশেষভাবে ফসলের জমিতে স্থাপন করে জমির অতিরিক্ত পানি অপসারণ করা হয়।

২. বাক্স নালা পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে আয়তকার নালা কেটে নালার দুই দিকের গায়ে পাথর বসানো হয়। এরপর নালায় পাথরের টুকরা বসিয়ে মাটি দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়।

৩. পাথর নালা পদ্ধতি

বাক্স নালার মতোই আয়তকার নালা কেটে তাতে ছোট বড় পাথর দিয়ে ভরে মাটি দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। পাথরের ফাঁক দিয়ে অতিরিক্ত পানি সরে যায়।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ মাটির আর্দ্রতা নির্ধারণ

উপকরণ

১. নিড়ানি বা কোদাল।

কাজের ধাপ

১. গম বা শাকসবজির যে কোনো একটি ফসলের মাঠে যাও।
২. জমিতে ১৫-২০ সেমি গভীর করে গর্ত কর।
৩. গর্ত থেকে এক মুঠ মাটি নিয়ে হাতের মুঠোয় চাপ দাও। যদি হাতের তালু ভিজে যায় তবে বুঝবে মাটিতে পানি আছে। এখনই সেচ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
৪. হাতের মুঠোয় চাপ দেওয়ার পর যদি মাটি দলা হয় তবে দলাটি নিচে ফেল। দলা যদি ভেঙে যায় তবে বুঝবে মাটিতে পানির অভাব রয়েছে। দুই-তিন দিনের মধ্যে সেচ দিতে হবে।
৫. হাতের মুঠোয় চাপ দেওয়ার পর যদি দলা তৈরি না হয় তবে বুঝতে হবে মাটি খুবই শুকনো। অতএব, তাড়াতাড়ি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

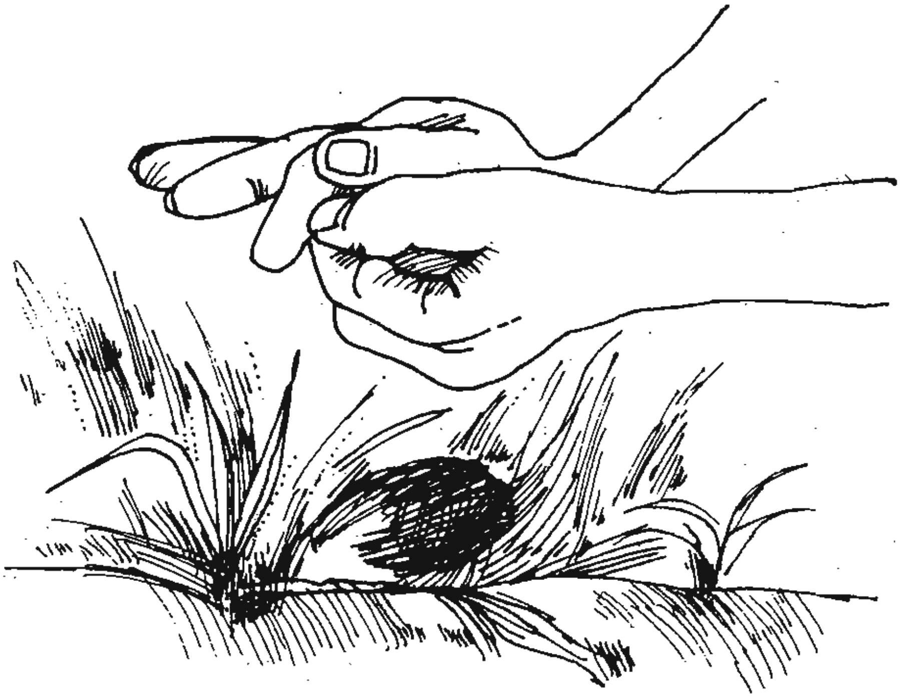

গর্তের তলা থেকে মাটি নিয়ে হাতের মুঠোয় চাপ

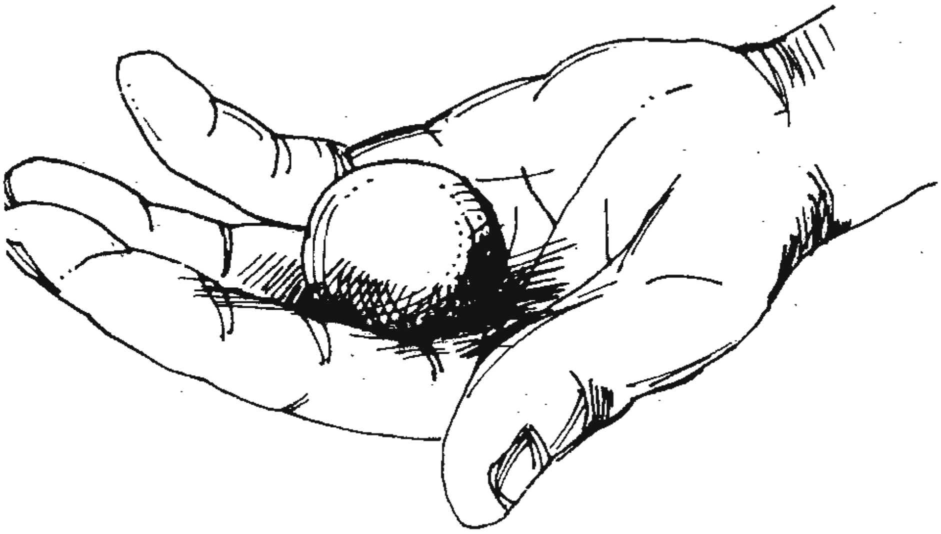

হাতের মুঠোয় চাপে মাটি দলা

বিষয় : কৃষি যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

উপকরণ

১. বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি।

কাজের ধাপ

১. কৃষি শিক্ষকের সাথে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গাণে বা পাশের কৃষকের বাড়িতে যাও।
২. সকল কৃষি যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ কর।
৩. পুস্তকে প্রদত্ত কৃষি যন্ত্রপাতির ছবির সাথে মিলিয়ে যন্ত্রপাতির চিত্র আঁক।
৪. প্রত্যেকটি কৃষিযন্ত্র শনাক্ত কর ও কাগজে যন্ত্রের নাম লেখ।
৫. কোন যন্ত্র দ্বারা কী কাজ করা হয় তা লেখ।

বিষয় : লাঙলের বিভিন্ন অংশ শনাক্তকরণ

উপকরণ

১. ১টি লাঙল ২. কাগজ কলম।

কাজের ধাপ

১. বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গাণে লাঙল পর্যবেক্ষণ কর।
২. লাঙলের প্রধান প্রধান অংশগুলো শনাক্ত করে চিত্র আঁক।
৩. বইয়ে প্রদত্ত ছবির সাথে অংশগুলো মিলিয়ে দেখ।
৪. ব্যবহারিক খাতায় একটি লাঙল আঁক ও শনাক্তকৃত অংশ লেবেল করে দেখাও।
৫. লাঙলের বিভিন্ন অংশের কাজ ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি পা চালিত যন্ত্র ?

ক. পাওয়ার ট্রিলার খ. মাড়াই যন্ত্র
গ. ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ঘ. প্যাডেল থ্রেসার

২. বৃত্তাকার সেচ পদ্ধতি কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

ক. মাঠ ফসল খ. সবজি বাগান
গ. ফল বাগান ঘ. চা বাগান

৩. নিচের চিত্রিত কোন যন্ত্র টি আগাছা দমনে ব্যবহৃত হয়-

চিত্র-১

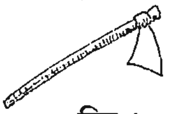
চিত্র-২

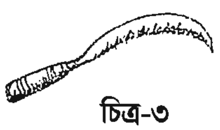
চিত্র-৩

চিত্র-৪

ক. চিত্র- ১ খ. চিত্র- ২
গ. চিত্র- ৩ ঘ. চিত্র- ৪

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

পাবনা সদর উপজেলার নয়া কৃষক নজরুল ইসলাম খরিপ-১ মৌসুমে পাট বীজ বোনার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কোনো বৃষ্টিপাতের লক্ষণ না থাকায় বাধ্য হয়ে সে জমিতে সেচ দেয়। এ পরিস্থিতিতে তাকে আরও ১৫-২০ দিন চাষের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এতে তার মনে পাট চাষে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়।

৪. নজরুল ইসলামকে সেচের পরেও ১৫-২০ দিন চাষের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে কারণ-

i. মাটির আর্দ্রতা পরিমাপ না করে সেচ দেওয়ায়
ii. মাত্রাতিরিক্ত সেচ নিয়ন্ত্রণ না করতে পারায়
iii. পাওয়ার ট্রিলারের ব্যবস্থা করতে না পারায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. ইসলাম সাহেব পাট ছাড়াও এ মৌসুমে নিচের কোন সারির সবগুলো ফসলই চাষ করতে পারে?

ক. আউশ ধান, পাট ও বাদাম খ. বেগুন, আমলকি ও জলপাই
গ. পাট, আউশ ধান ও করলা ঘ. মিষ্টিকুমড়া, পটল ও তাল

সৃজনশীল প্রশ্ন

জামাল মিয়া তার লিচু বাগানে প্রতিবছর শক্তিচালিত সেচ যন্ত্রের সাহায্যে সেচ দেন। তিনি একই সেচ যন্ত্র দিয়ে আলুর জমিতেও সেচ দিয়ে থাকেন। এবার অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় তার আলুর জমিতে পানি জমে যায়। তিনি জমির অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ক. সেচ কী?
খ. জামাল মিয়া কেন আলুর জমির অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করেন।
গ. জামাল মিয়া তার আলুর জমিতে যে সেচ পদ্ধতির ব্যবস্থা করেছিলেন তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শক্তিচালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শস্য সংরক্ষণ

পোকামাকড়, রোগবালাই, ইঁদুর ইত্যাদির আক্রমণ থেকে খেতের শস্য রক্ষার ব্যবস্থাপনাকে শস্য সংরক্ষণ বলে। পোকামাকড়, রোগবালাই ও ইঁদুর ফসলের প্রধান শত্রু। উৎপাদিত ফসলের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতি বছরই এদের দ্বারা নষ্ট হয়। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা যায়।

ফসলের খেতে ক্ষতিকর পোকার সাথে নানাপ্রকার উপকারী পোকাও থাকে। এরা ফুলের পরাগায়ণে সাহায্য করে এবং ক্ষতিকর পোকামাকড়ের ডিম ও কীড়া খেয়ে অনেক উপকার করে। অতএব, উপকারী পোকা রক্ষা করেই ক্ষতিকর পোকা দমন করা উচিত।

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা বলতে উপকারী পোকা রক্ষা করে কয়েকটি দমন পদ্ধতি একযোগে গ্রহণ করে ক্ষতিকর পোকা দমন করাকে বোঝায়। সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে একাধিক দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে বালাইয়ের আক্রমণ প্রতিহত করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূর্ণ বয়স্ক পামরি পোকা হাতজাল বা মশারি দ্বারা ধরে মারা যায়। ধান গাছের আক্রান্ত পাতার অগ্রভাগ কীড়াসহ কেটে মাঠ হতে মারা যায়। একই সাথে গাছের ডালে পাখির আগমন ঘটিয়ে পাখি দ্বারা পোকামাকড় কমানো যায়। এসব ব্যবস্থা এক সাথে গ্রহণ করার পরও যদি পোকা দমন সম্ভব না হয় তবেই সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সঠিক কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

ক. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপকারিতা

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার মধ্যে অনেক উপকার আছে। নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হল।

১. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে ও পরিবেশের জৈবিক ভারসাম্য রক্ষা করে।
২. উপকারী পোকামাকড়, ব্যাঙ ও মাছ সংরক্ষণ করে।
৩. কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে আনে।
৪. কম খরচে ফসল সংরক্ষণে সাহায্য করে।
৫. খাদ্য দ্রব্যকে কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্ত রাখে।

খ. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপাদান

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপাদান ৪টি।

১. আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি
২. যান্ত্রিক দমন
৩. জৈবিক দমন
৪. রাসায়নিক পদ্ধতি।

আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি

ক. গভীরভাবে জমি চাষ করা

গভীরভাবে জমি চাষ করা হলে মাটির নিচের ক্ষতিকর পোকামাকড় ও কীট মাটির উপরে আসবে। এতে প্রখর রোদে কিছু মারা যাবে এবং কিছু পাখিরাও খাবে।

খ. পর্যায়ক্রমে চাষ করা

এক এক পোকা এক এক ফসল আক্রমণ করে। কোনো জমিতে একই ফসল বারবার চাষ করলে সেই জমিতে পোকার আক্রমণ বেশি হবে। কিন্তু উৎপাদন পরিকল্পনা মোতাবেক পর্যায়ক্রমে একখণ্ড জমিতে বিভিন্ন মৌসুমে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ করলে পোকা ও রোগের আক্রমণ কম হয়। যেমন– পাট চাষের পর রোপা আমনের চাষ করলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

গ. সুষম মাত্রায় সারের ব্যবহার

জমিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করলে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। কোনো ফসলে ইউরিয়া সার বেশি প্রয়োগ করলে গাছের ডগা ও পাতা বেশি রসালো হয়। এতে পোকা অধিক আকৃষ্ট হয়। আবার পটাশ সার কম পড়লে রোগের আক্রমণ বেশি হয়। অতএব, সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা উচিত।

ঘ. সেচ ব্যবস্থাপনা

অনেক পোকা আছে যেগুলো মাটির নিচে কচি চারা কেটে দেয়। যেমন-উরচুঙ্গা। পাটের জমিতে উরচুঙ্গা অনেক ক্ষতি করে। উরচুঙ্গায় আক্রান্ত পাটের জমিতে প্লাবন সেচ দিলে পোকা দমন করা যায়। আবার ধান খেত হতে পানি সরিয়ে চুঙ্গি পোকা দমন করা যায়।

ঙ. রোপণ দূরত্ব

পাতলা করে চারা রোপণ করলে ধান খেতে বাদামি গাছ ফড়িং-এর আক্রমণ কমানো যায়।

চ. উন্নত জাতের ফসলের চাষ

ফসলের অনেক উন্নত জাত আছে যেগুলো রোগ ও পোকা প্রতিরোধক। যেমন বিআর- ১০ ধানের জাত টুংরো ভাইরাস ও ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। চান্দিনা ধান মাজরা পোকা প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

যান্ত্রিক দমন

হাত বা ফাঁদ দ্বারা পোকা দমনকে যান্ত্রিক দমন বলে। যান্ত্রিক দমনের অনেক উপায় আছে। নিচে কয়েকটি যান্ত্রিক দমনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ক. হাতে পোকা ধরা

ফসলের খেত হতে হাত দিয়ে পোকামাকড়ের ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে দমন করা যয়। ধান ও আখ খেতের মাজরা পোকা এভাবে দমন করা যায়। আবার ধানের পামরি ও সবুজ পাতা ফড়িং হাতজাল দিয়ে সংগ্রহ করে ধ্বংস করা যায়।

খ. পাতার আগা কাটা

পামরি পোকা ও পাতা মোড়ানো পোকা সাধারণত ধান গাছের পাতার আগায় প্রথম আক্রমণ করে। এমতাবস্থায় গাছের পাতার আগা কেটে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

গ. আক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলা

গাছে রোগ বা পোকার আক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলেই আক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলা উচিত। এতে সমস্ত শস্যখেতে রোগ ও পোকার আক্রমণ ছড়ায় না।

ঘ. আলোর ফাঁদ

আলোর ফাঁদ পেতে কীটপতঙ্গ আলোর দিকে আকৃষ্ট করে পোকা মারা যায়। রাতে জমিতে একটি পাত্রে কেরোসিন বা কীটনাশক মিশ্রিত পানি রাখতে হবে। ঐ পাত্রের উপর একটি হারিকেন ঝুলিয়ে রাখলে অনেক পোকা হারিকেনের আলোর প্রতি আকৃষ্ট হবে। এতে পোকাগুলো কীটনাশক বা কেরোসিনের পাত্রে পড়ে মারা যাবে। পূর্ণাঙ্গ মাজরা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং ও গান্ধী পোকা আলোর ফাঁদ পেতে দমন করা যায়।

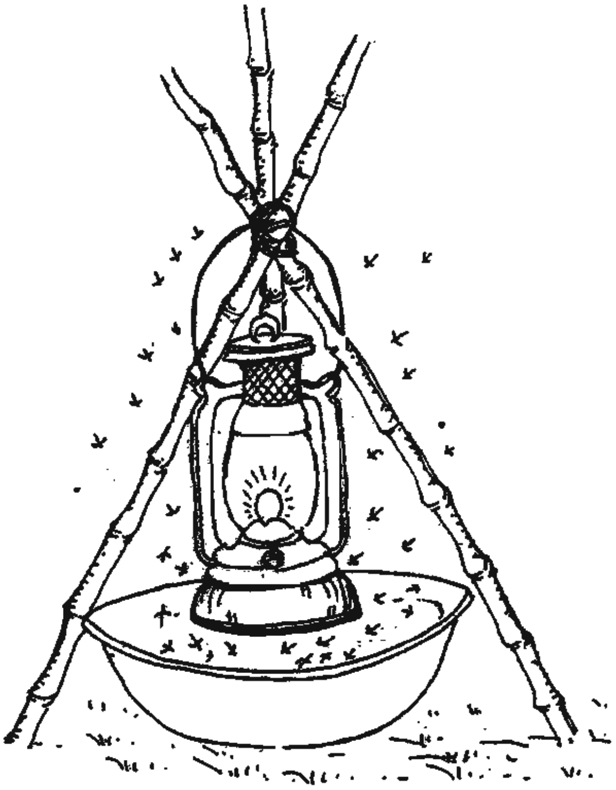

আলোর ফাঁদ পেতে পোকা দমন

জৈবিক দমন

পরজীবী পোকা ও পাখি ব্যবহার করে পোকামাকড় দমনকে জৈবিক দমন বলা হয়। অনেক পোকা আছে যেগুলো অন্য পোকা খেয়ে বেঁচে থাকে। এসব পোকাকে পরজীবী বা পরভোজী পোকা বলে। যেমন- নেকড়ে মাকড়সা, লেডিবার্ড বিটল, মিরিড বাগ ও পরজীবী পোকা। নিচে কয়েকটি পরজীবী পোকার বিবরণ দেওয়া হল।

নেকড়ে মাকড়সা

আবাসস্থল : ধানখেত নেকড়ে মাকড়সার আবাসস্থল। এরা বেশিরভাগ সময় ধান গাছের গোড়ায় থাকে।

খাদ্য : নেকড়ে মাকড়সা জাল বানায় না। পোকার উপর সরাসরি আক্রমণ করে খায়। পূর্ণবয়স্ক মাকড়সা নানা প্রকার পোকা ধরে খায়। এগুলোর মধ্যে ধানের মাজরা পোকার মথ অন্যতম।

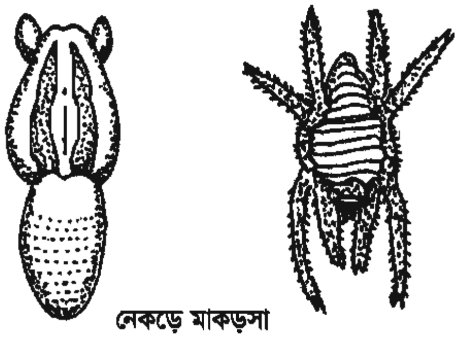

নেকড়ে মাকড়সা

ঘাস ফড়িং

আবাসস্থল : ঘাস ফড়িং-এর মধ্যে শুঁড় লম্বা ঘাস ফড়িং পরজীবী। এই ঘাস ফড়িং গাছের পাতা ও শীষে অবস্থান করে। বাড়ন্ত বয়সের ধান গাছে এদের অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়।

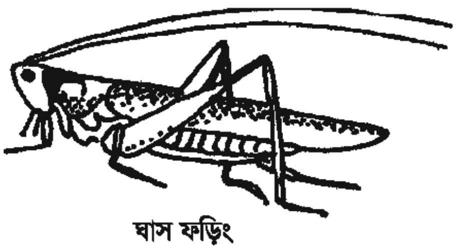

ঘাস ফড়িং

খাদ্য : এ ঘাস ফড়িং শোষক পোকা, মাজরা পোকা ও গান্ধী পোকার বাচ্চা খেয়ে থাকে। রাতের বেলা এরা শিকার ধরে থাকে।

ড্যামসেল মাছি

আবাসস্থল : পূর্ণবয়স্ক ড্যামসেল মাছি ধান গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে উড়ে বেড়ায়। আর বাচ্চাগুলো পানিতে থাকে। কিন্তু পাতা ফড়িং ও গাছ ফড়িং-এর বাচ্চা ধরে খাওয়ার জন্য এরা গাছের পাতা বেয়ে উপরে উঠে যায়।

ড্যামসেল মাছি

খাদ্য : এই মাছি বিভিন্ন ধরনের ফড়িং ও পাতা মোড়ানো পোকা ধরে খায়।

লেডিবার্ড বিটল

আবাসস্থল : লেডিবার্ড বিটল কুমড়া জাতীয় গাছ এবং ধানখেতসহ প্রায় সব ফসলেই দেখা যায়।

খাদ্য : যে সমস্ত পোকা আস্তে আস্তে চলাফেরা করে তাদেরকেই এরা শিকার করে। এই পোকা শোষক পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা ও মাজরা পোকা খেয়ে থাকে। বাচ্চা লেডিবার্ড বিটল পূর্ণ বয়স্কদের চেয়ে বেশি পোকা খেতে পারে।

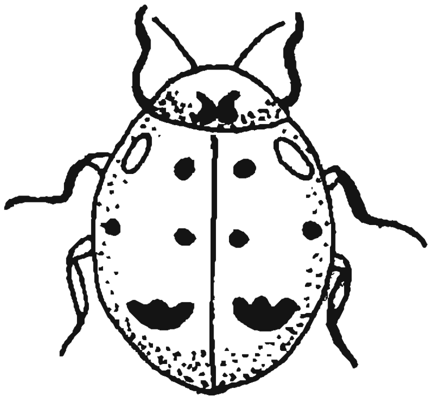

লেডিবার্ড বিটল

মিরিডবাগ

আবাসস্থল : মিরিডবাগেরও আবাসস্থল ধানখেত। পাতা ফড়িং ও গাছ ফড়িং দ্বারা আক্রান্ত ধানখেতে এই পোকা প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়।

খাদ্য : মিরিডবাগ ধান গাছের পাতার খোলে বা গাছের কাণ্ডে পাতা ফড়িং-এর ডিম খুঁজে বেড়ায়। ডিমের ভেতরে শুঁড় ঢুকিয়ে ডিমগুলো শুষে খায়।

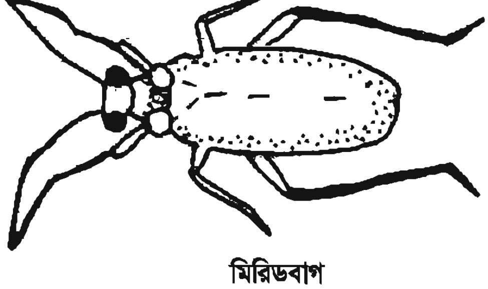

মিরিডবাগ

পোকা খাদক পাখি ও ব্যাঙ

প্রায় সকল ধরনের পাখি ফসলের খেতের পোকা মাকড় খেয়ে আমাদের অনেক উপকার করে। এরূপ পাখিদের মধ্যে ফিঙে, শালিক, দোয়েল, ময়না প্রধান। এছাড়াও কাক, বাজপাখি, পেঁচা ইঁদুর খেয়ে ইঁদুর দমনে সাহায্য করে। খেতের আইলের পাশে লাউ ও শিমের মাচা দিলে অথবা খেতে গাছের ডাল বা জাংলাসহ বাঁশ পুঁতে দিলে পাখি বসার সুযোগ পায়। এরা খেতের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পোকা খেয়ে পোকা দমনে সহায়তা করে।

ব্যাঙ

ব্যাঙ পানিতে ও মাটিতে উভয় স্থানেই বাস করে। পোকামাকড়ই ব্যাঙের প্রধান খাদ্য। ফসলের খেতের পোকা দমনের জন্য ব্যাঙকে ব্যবহার করা যায়।

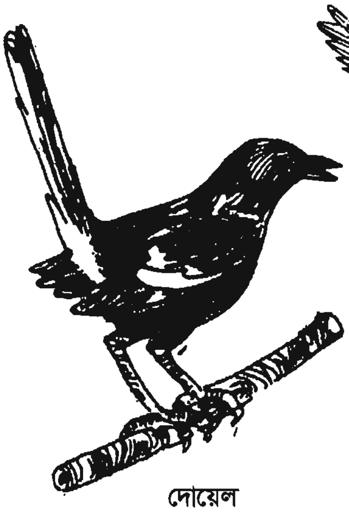

দোয়েল

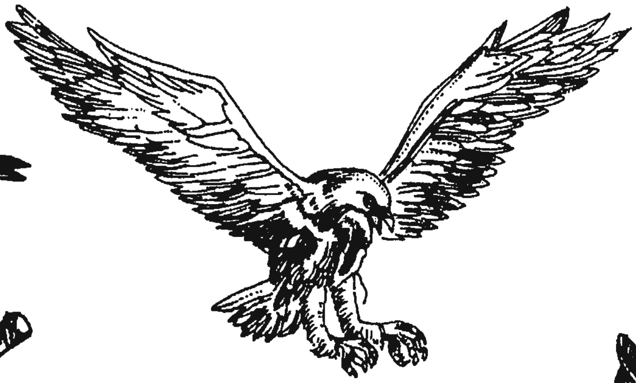

ঈগল

ব্যাঙ

পেঁচা

রাসায়নিক পদ্ধতি

রাসায়নিক পদ্ধতি সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার একটি উপায়। এই পদ্ধতি তখনই ব্যবহার করা হয় যখন পোকার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে যান্ত্রিক বা জৈবিক উপায়ে দমন সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ধানের খেতে প্রতি বর্গমিটারে ৩টি স্ত্রী মথ অথবা ৩টি ডিমের গাদা বা রোপণের ৪০ দিন পর্যন্ত শতকরা ১০ ভাগ মরা ডগা দেখা দিলে রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে।

ইঁদুর দমন

ইঁদুর মানুষের ঘরে এবং ফসলের খেতে ক্ষতি করে। এরা মানুষের খাদ্যে ভাগ বসায়। ইঁদুর ফসলের শতকরা প্রায় ১০-২০ ভাগ ক্ষতি করে থাকে। ইঁদুর দিনরাত কাঠ, কাপড়, আসবাবপত্র ও ফসল কাটতে থাকে। এরা শুধু জিনিসপত্রেরই ক্ষতি করে না, নানা ধরনের মারাত্মক রোগও ছড়ায়। ইঁদুর প্লেগ রোগ ছড়িয়ে থাকে। এই রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। কয়েক জাতের ইঁদুর ফসলের মাঠে বা বাড়িঘরে দেখতে পাওয়া যায়।

১. কালো ইঁদুর
২. গেছো ইঁদুর
৩. বাদামি ইঁদুর।

বাংলাদেশে বাদামি ইঁদুরের উপদ্রব বেশি।

একজোড়া ইঁদুর বছরে গড়ে ৮০০-১০০০টি বাচ্চা দিতে পারে।

ইঁদুরের উপস্থিতির লক্ষণ

ইঁদুরের উপস্থিতির লক্ষণ নিম্নরূপ।

১. **ইঁদুরের মাটি :** ইঁদুর ঘরবাড়িতে ও ফসলের মাঠে গর্ত করে থাকে। ইঁদুরের গর্তের মাটির দানা দেখে এদের উপস্থিতি বোঝা যায়।

২. **চলাচলের রাস্তা :** নরম মাটিতে ইঁদুর চলাফেরা করলে পায়ের চিহ্ন পড়ে। রাস্তা পরিষ্কার করে এরা চলাফেরা করে।

৩. **বিষ্ঠা :** ইঁদুরের বিষ্ঠা দেখে এদের উপস্থিতি বোঝা যায়।

৪. **গন্ধ :** ইঁদুর খারাপ গন্ধ ছড়ায়। এই গন্ধ থেকেও ইঁদুরের অস্তিত্ব বোঝা যায়।

ইঁদুর

৫. **ক্ষতির চিহ্ন :** ইঁদুর যা কিছু কাটে তেরছা করে কাটে। এই কাটা চিহ্ন দেখে ইঁদুরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

৬. **শব্দ :** ইঁদুর চলাফেরার সময় খসখস শব্দ হয় এবং কোনো কিছু কাটার সময় কুটকুট আওয়াজ পাওয়া যায়।

ইঁদুর দমন

বিভিন্ন পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন করা যায়।

১. ইঁদুর মারার ফাঁদ
২. বিষটোপ
৩. ইঁদুরের গর্তে পানি ঢালা
৪. বিড়াল পালন করা।

১. ইঁদুর মারা ফাঁদ

বাজারে ইঁদুর মারার অনেক রকম ফাঁদ পাওয়া যায়। খাবারের টোপ দিয়ে ইঁদুরকে ফাঁদে ফেলে মারা যায়।

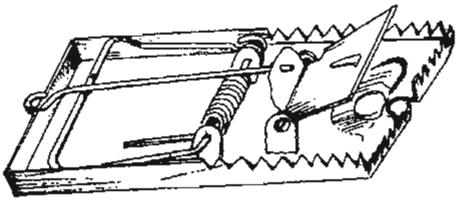

ইঁদুর মারার ফাঁদ

২. বিষটোপ

জিংক ফসফাইড, রেকুমিন, ফসটকসিন প্রভৃতি ইঁদুরনাশক ওষুধ দিয়ে বিষটোপ তৈরি করে ইঁদুরের গর্তে অথবা চলার পথে রাখলে ইঁদুর খেয়ে মারা যায়। ল্যানিরেট নামক আরো এক ধরনের লাল দানার মতো ওষুধ পাওয়া যায়। ১০ গ্রাম বিষাক্ত দ্রব্য ইঁদুরের চলার পথে রাখলে ইঁদুর খেয়ে মারা যায়।

৩. গর্তে পানি ঢালা

ইঁদুরের গর্তে প্রচুর পানি ঢেলে ইঁদুর মারা যায়।